লেখকদের প্রেম

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬২ ৮জুন ১৯৫৫

প্রচ্ছদ
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীশ্রীনররতন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক মুদ্রিত।।

ডাঃ শেখর চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের লেখা :

এই প্রেম (উপন্যাস)

রাত্রি ও আলো (কবিতা)

টি-বি সম্বন্ধে (প্রবন্ধ)

প্রেম সম্পর্কে অনেকেরই বোধহয় কিছুটা কৌতূহল আছে। অবশ্য ঠিক সেই কথা বিবেচনা করেই যে এই বই লেখা হয়েছে তা নয়। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, গোড়া থেকে বিশেষ চিন্তা বা পরিকল্পনা করে এ বই লেখা নয়। বছর দুই-তিন পূর্বে ডক্টর জনসন-এর ওপর লেখা একটি বই পড়ে আমি তাঁর প্রেম ও প্রেম-জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে পড়ি। অতঃপর আরো গুটিদুই গ্রন্থ পাঠ করে ঐ বিষয়ে একটি ছোটো প্রবন্ধ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্য লিখে ফেলি। লেখাটি প্রকাশের পর ঐ দৃষ্টিকোণ হতে ডিকেন্স সম্পর্কেও কিছু লিখি। 'ডিকেন্স ও তাঁর প্রেম' 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হলে 'যুগান্তর' ও অন্য একটি পত্রিকাতেও একে একে আরো গুটিকয় প্রবন্ধ লিখি। অতঃপর এই ধরনের একটি ক্ষুদ্র পুস্তক পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা আমার মনে জাগে এবং অল্প দিনের মধ্যেই আরো একটি প্রবন্ধ লিখে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ফেলি। এই হচ্ছে এ-পুস্তক রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যাই হোক, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী লেখকের জীবনের প্রেম সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ প্রবন্ধ দেওয়া হলো। অবশ্য বলা বাহুল্য এঁরা কেউ-ই সাধারণ লেখক নন, প্রায় সকলেই যুগান্তকারী সাহিত্যস্রষ্টা। এঁদের সকলের প্রতিই আমার অন্তরে আছে গভীর শ্রদ্ধা। তবু এঁদের সম্পর্কে লিখতে বসে এঁদের দোষত্রুটিগুলিও আমি কিছু কিছু বিশ্লেষণ করেছি। সময় সময় কিছু তির্যক কটাক্ষপাতও করা হয়েছে। এটা যে শ্রদ্ধার অভাববশত হয়েছে তা নয়। এই সব অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের যতদূর সম্ভব রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ-রূপে দেখানোর জন্যই এটা করা হয়েছে। এসব কথা এখানে লেখার হয়তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু লিখলাম পাছে কেউ ভুল বোঝেন এই আশঙ্কায়।

এর পর আর কয়েকটি কথা। বলা নিষ্প্রয়োজন, কয়েকজন বিদেশী লেখক বা সাহিত্য-স্রষ্টার প্রেম সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেওয়ার জন্যই এই প্রবন্ধগুলি লেখা।

কিন্তু কোনো ব্যক্তির প্রেম সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে তাঁর জীবন সম্বন্ধেও কিছু লেখা প্রয়োজন। বিশেষত এই সব বিশ্ববিখ্যাত কবি ও কথাশিল্পীর জীবন সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কৌতূহলও দেখা যায় যথেষ্ট। সেজন্য আমি সব প্রবন্ধেরই প্রথমে এঁদের জীবন সম্বন্ধেও মোটামুটি কিছু লিখেছি। তারপর তাঁদের প্রেম সম্পর্কে যতটা তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা সংক্ষেপে পরিবেশন করেছি। বলা বাহুল্য পাঁচখানা প্রামাণিক বিদেশী গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করেই এগুলি লেখা। এই সব গ্রন্থের নাম আর এখানে দিলাম না। কারণ তা হলে অনেক নাম দিতে হয়। তবে শুধুমাত্র একটি যে বাংলা বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তার নামটা এখানে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি। সেটি হচ্ছে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের লেখা 'কবিগুরু গ্যেটে।' বলা বাহুল্য, কাজী সাহেব ও অন্যান্য বিদেশী লেখক,—সকলের কাছেই আমি ঋণী।

ঋণ আরো অনেকের কাছে আছে। ডাঃ সুধাংশুলাল সরকার এই গ্রন্থে ব্যবহৃত অধিকাংশ ফরাসী শব্দগুলির উচ্চারণ লেখায় আমাকে সাহায্য করে বিশেষভাবে বাধিত করেছেন। রাশিয়ান শব্দগুলির উচ্চারণ লেখায় সাহায্য করেছেন আমার বাল্যবন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ।

এঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

ভূমিকা ঃ লেখকদের প্রেম	১
ডক্টর জনসন	৭
গ্যেটে	১৮
স্তঁাদাল	৩৬
জন কীটস্	৪৬
বালজাক	৮০
চার্লস্ ডিকেন্স	৯৮
ফ্লোবের	১০৮
টলস্টয়	১১৮

ভূমিকা ঃ লেখকদের প্রেম

কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী লেখকের প্রেম-জীবন সম্পর্কে কিছু আভাস দিতে উদ্যত হয়ে আমার মনে হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রেম সম্বন্ধেও কিছু লেখা প্রয়োজন। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, প্রেম সম্বন্ধে কিছু লেখা খুব সহজ নয়। প্রেম বোধহয় জীবনের মতই গভীর রহস্যময়। জীবনের মতই এর অসংখ্য দিক ও অসংখ্য লক্ষ্য। তার কিছু আলোকিত, কিছু অন্ধকার। অন্ধকারই মনে হয় বেশী। তাছাড়া বিচিত্র এর গতি ও প্রকৃতি। সম্পূর্ণ না হলেও তার অনেকখানিই আজও দুর্বোধ ও দুর্জ্ঞেয়।

তাই প্রেমের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করা শক্ত। বিভিন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তা বিভিন্নভাবে উৎসারিত। কখনো তা শুধুমাত্র দেহের ভূমিতেই আবদ্ধ, কখনো তা অদৃশ্য পাখায় ভর করে আকাশচারী। আবার কখনো তা আকাশ ও মৃত্তিকায় সমান স্বচ্ছন্দচারী।

অবশ্য অনেকে মনে করেন আকাশচারী বা প্লেটনিক প্রেম একেবারেই সম্ভব নয়। সুতরাং কামহীন প্রেম সোনার পাথর বাটির মতই অসম্ভব বস্তু। তাঁদের মতে দেহলিপ্সা-পরিশূন্য যে-প্রেম তা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং এই ধরনের প্রেম বলে যা সচরাচর পরিচিত তা একরকম 'পারভারশন'। তাঁরা বলেন কামই হচ্ছে

প্রেম। প্রেম কামেরই ভদ্র নাম। যেমন খেঁদির ভালো নাম মঞ্জুলা বা মনীষা।

আবার কেউ কেউ বলেন, প্রেম কাম হতে উদ্ভূত হলেও পরিপূর্ণ অর্থে তা কাম নয়। প্রেম কামের অত্যন্ত সুপরিস্রুত সুকুমার অংশ। অনেক অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে তবে কাম একদা প্রেমে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়। প্রথমে দেহাশ্রিত হলেও পরে তা দেহাতীত অবস্থায় এসে পৌঁছয় এবং তখনই তাকে প্রকৃত প্রেম বলা চলে। অপরাজিতার বীজকে যেমন অপরাজিতা ফুল বলা চলে না তেমনি কামকেও প্রেম নয়। দিনে দিনে ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সংস্কৃতিই মানুষের অন্তরে প্রেমের জন্ম দিয়েছে। প্রেমই মানুষের মহোত্তম অনুভূতি এবং মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

বলা বাহুল্য বিষয়টি বিতর্কমূলক। এবং যে-অনুভূতি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির প্রকৃতিনির্ভর তাতে তর্কের সম্ভাবনা থাকবেই। তবু কোনো রকম তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা চলে যে, যে-চরিত্রেরই হোক, প্রেম সুদূর অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে। বাঁচার ইচ্ছার মত প্রেমের তৃষ্ণাও বোধহয় মানুষের সহজাত।

যাই হোক, দেখা যায় প্রেম বহুবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কখনো সে শুধুমাত্র সম্ভোগেচ্ছা, কখনো সে বিশুদ্ধ ভালোবাসার তৃষ্ণা। কখনো সে মূর্ত, আবার কখনো সে অদৃশ্য, অনির্ণেয়, অনির্বচনীয়।

বিচিত্র প্রেমের গতি ও প্রকৃতি। কখন্ সে জাগে, কখন্ সে ঘুমোয়, কখন্ সে আসে, কখন্ সে যায় তার কোনোই স্থিরতা নেই। কখন্ যে সে হাসে, কখন্ যে সে কাঁদে তারও কোনো ঠিক নেই।

কাঁদেই বোধহয় বেশী। প্রেম সুখের জন্য নয়—একথা বহু কবি ও মনীষীই বলেছেন।—'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে ভালোবাসা!'—অন্তরে এই অবাক প্রশ্ন অনেকেরই।—মনে হয় গভীর প্রেম হয়তো গভীর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই 'হুঁহু কোরে হুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

অভিজ্ঞজনেরা বলেন—যারা সুখের জন্য প্রেমের পিছু ঘোরে তারা কিছুই পায় না,—না প্রেম,—না সুখ। কবিও বলেছেন—'ওরা সুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মেলে না,—সুখও চলে যায়।'

তাই মনে হয় গভীরতম এবং মধুরতম বেদনাই প্রেমের প্রধানতম অঙ্গীকার। তবু আশ্চর্য, মানুষের অন্তরে প্রেমের তৃষ্ণা অনির্বাণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যাপক বা গভীর যে-কোনো অর্থেই হোক, প্রেমের অনুভূতি ছাড়া জীবন যেন শূন্য, শূন্য,—বড় শূন্য। প্রেমের যাদুকরী স্পর্শ ব্যতীত জীবনের যেন কোনো অর্থই থাকে না। তাই প্রেম যত ক্ষণস্থায়ী হোক, প্রেমের জন্য প্রায় সকলেই আকুল। কবি শেলীও বলেছেন,—'I love love though he has wings and like light can flee.'

কিন্তু যাক এসব কথা। এসব কথার শেষ নেই। সুতরাং বিশেষ করে লেখক বা সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রেম সম্পর্কে আর দুচার কথা লিখে শেষ করা যাক এই ভূমিকা। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে—সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রেমের কি বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে?—আমি তো যতটুকু পড়েছি, এবং যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে,—না, সে-রকম কিছু নেই। তাঁরাও আর পাঁচজনের মত ভালোবেসেছেন, ভালোবাসার পাত্রীকে কাছে পেতে

চেয়েছেন,—তাদের নিয়ে কল্পনার স্বর্গ গড়েছেন মনে মনে। তারপর আর পাঁচজনের মতই কেউ সুখী বোধ করেছেন নিজেকে,—কেউ চরম অসুখী। কারো মনে হয়েছে প্রেম স্বর্গীয়,—সে জীবনে নিয়ে আসে অনিন্দ্য আনন্দ। আবার কারো মনে হয়েছে প্রেমে আছে শুধু দুঃখ আর জ্বালা,—যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা।

না, সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রেমের কোনো বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি। অবশ্য কোনো কোনো কবি বা কথাসাহিত্যিকের অদ্ভুত বা অসুস্থ প্রেমের কথাও শোনা যায়। কিন্তু সে-রকম তো সাধারণ মানুষের মধ্যেও আছে। বরং বেশীই আছে। কারণ তাদের সংখ্যা লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী। যাই হোক, আমি যে-সব কবি ও কথাশিল্পীর কথা এখানে লিখেছি তাঁদের প্রেমে সে-রকম কোনো অস্বাভাবিক বা অসুস্থতার লক্ষণ দেখি নি। তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা চলে যে তাঁদের সকলের প্রকৃতি যেমন অভিন্ন নয় তেমনি তাঁদের প্রেমের প্রকৃতিও। সুতরাং তাঁদের প্রেমের চরিত্র ও কাহিনীতে যে কিছু কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকবে সে-কথা বিশেষ করে বলাই নিষ্প্রয়োজন।

কবি ও কথাশিল্পীদের প্রেম সম্পর্কে কিছু জানাতে প্রবৃত্ত হয়ে আরো একটি বিষয় সম্বন্ধেও সামান্য কিছু লেখা প্রয়োজন বোধ করছি। সেটি হচ্ছে Sublimation বা যৌনাবেগের উদ্‌গতির কথা। ফ্রয়েড প্রমুখ বহু মনীষীই বলেছেন যে শিল্পীদের এই Sublimation-এর এক বিশেষ ক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ তাঁদের যৌনাবেগের অনেকখানিই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় পরিণত ও সেই কাজে ব্যয়িত হয়। এ-থেকে এই রকম

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে শিল্পীদের প্রেমের তৃষ্ণা প্রবল থাকলেও তুলনায় যৌনসম্ভোগেচ্ছা কিছু কম থাকাই সম্ভব। অবশ্য এ-কথা প্রমাণ করা শক্ত। কারণ সে-রকম অন্তরঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়। রুসো, আঁদ্রে জিদ প্রভৃতির মত বিশ্লেষণমূলক অকপট আত্মজীবনী অল্প লেখকই লিখেছেন। তবে কোনো কোনো কথাশিল্পীর জীবন পর্যালোচনা করলে মনে হয় এর মধ্যে কিছুটা সত্য হয়তো আছেও। ফ্লোবের জীবনে একাধিক প্রেমের ব্যাপারে জড়িত হয়েও পরিণত বয়সে বলেছেন যে তিনি নাকি ভার্জিন। গ্যেটে-এর জীবনেও দেখা যায় যে তিনি বহু নারীকে ভালোবেসেছেন এবং বহুবার প্রেমের যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছেন। তাঁর যৌনক্ষুধা খুব প্রবল হলে নিশ্চয়ই অনেক কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটতো। কিন্তু দেখা গেছে তা হয় নি। এমনি আরো অনেকের জীবনে দেখা গেছে। অবশ্য এ-থেকে সামান্যীকরণ একেবারেই সম্ভব নয়। টলস্টয় এবং আরো দু-একজনের যৌনক্ষুধা যে প্রবল ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিষয়টি সত্যিই অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জটিল ও রহস্যময়। সুতরাং আমার মত অবিশেষজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু না-লেখাই বাঞ্ছনীয়। তাই এদিকে সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

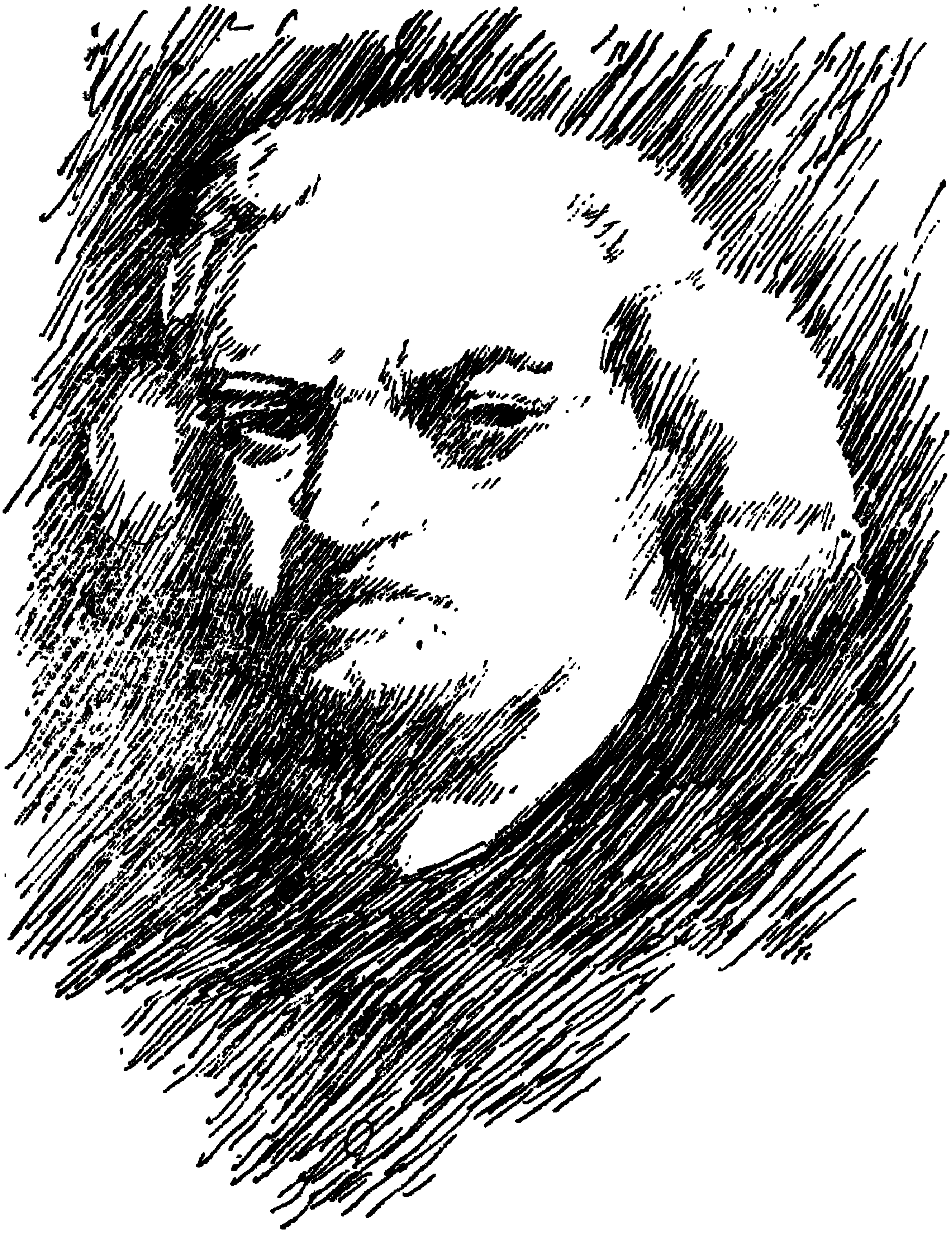

Samuel Johnson 1709 A. D.-1784 A. D.

ডক্টর জনসন

ডক্টর জনসন-এর নাম জানেন না এমন শিক্ষিত ব্যক্তি বোধহয় আমাদের দেশেও বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের তিনি ছিলেন একজন দিক্‌পাল পণ্ডিত, একজন প্রখ্যাত লেখক ও বিশিষ্ট চিন্তানায়ক। যেমন অসাধারণ ছিল তাঁর মেধা ও বুদ্ধি, তেমনি অসাধারণ ছিল তাঁর অধ্যবসায়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও দীর্ঘ আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে শুধুমাত্র একক চেষ্টাতেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—'ডিক্‌শনারি অব দি ইংলিশ ল্যাংগোয়েজ' রচনা সমাপ্ত করেন। এটা কম বিস্ময়ের কথা নয়।

১৭০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর স্যামুয়েল জনসন-এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র পুস্তক-বিক্রেতা। তার ফলে ছেলে-বেলা থেকেই জনসন-এর পড়াশোনার নেশা। তাঁর মেধাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি একবার যা পড়তেন তা আর ভুলতেন না। শৈশব হতেই তাঁর অদ্ভুত মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালে তাঁকে যে শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন তিনি বলতেন এরকম মেধাবী ছেলে তিনি তাঁর জীবনে আর কখনও দেখেন নি। পরবর্তী কালে স্কুলে একদা একটি ল্যাটিন কবিতা একবার মাত্র পড়েই মুখস্থ আবৃত্তি করে তিনি তাঁর

শিক্ষকদের একেবারে অবাক করে দেন। জনৈক শিক্ষক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন,—'তুমি যা পড়ো তা কি কখনো ভোলো না?'—তিনিও বিস্মিত ভাবে উত্তর দেন,—'তা কি কেউ ভুলতে পারে!'—অর্থাৎ তাঁর তখন ধারণা সকলেই তাঁর মত। কেউ-ই একবার পড়ে তা আর ভোলে না।

কিন্তু এমনি বিস্ময়কর মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও জনসন ছাত্র-জীবনে অক্সফোর্ড হতে ডিগ্রিলাভ করতে পারেন নি। অর্থের অভাবে তিনি তাঁর শিক্ষাই সমাপ্ত করতে পারলেন না। দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তিনি। মাত্র আড়াই পেনি নিয়ে তিনি নাকি প্রথম লণ্ডনে আসেন। অবশ্য এই প্রথম আগমন সম্পুর্ণ-ই নিষ্ফল হয়। তবে পরে তিনি তাঁর বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও বিশেষ বাগ্‌বৈদগ্ধের বলে ধীরে ধীরে লণ্ডনকে সম্পুর্ণ জয় করে ফেলেন এবং এক সময় লণ্ডনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একেবারে মধ্যমণি হয়ে ওঠেন।

১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অভিধান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইংল্যাণ্ডের বিদ্বজ্জন মহলে সাড়া পড়ে যায়। অভিধান প্রকাশের কিছু পূর্বেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাঁকে এম-এ ডিগ্রি প্রদান করেন। পরে ডাবলিন ইউনিভার্সিটি তাঁকে এলএল. ডি. উপাধি দেন। অবশেষে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাঁকে আবার ডি. সি. এল. অর্থাৎ ডক্টর অব সিভিল ল উপাধি প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তাঁকে বার্ষিক তিনশ পাউণ্ড বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দেন। অবশ্য তীব্র আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন ডক্টর জনসন প্রথমে এই সরকারী বৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক

ছিলেন না; পরে তাঁর বিখ্যাত শিল্পীবন্ধু রেনল্ডস্-এর বিশেষ অনুরোধেই তিনি এই বৃত্তি গ্রহণে সম্মত হন।

শুধুমাত্র অভিধান প্রণয়ন নয়, ডক্টর জনসন কাব্য ও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার সাহিত্য-মূল্যও অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে কার্লাইল প্রমুখ চিন্তানায়কেরা যেমন তাঁর অভিধানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, তেমনি বায়রন-এর মত প্রতিভাবান কবিও তাঁর 'দি ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেস্' কাব্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁর শেষ বয়সের লেখা 'লাইভস্ অব দি পোয়েটস্'-ও সে-সময় যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বলা বাহুল্য ডক্টর জনসন সম্পর্কে অনেক কথাই বলবার ও জানবার আছে। সে-সব কথা এই স্বল্লায়তন প্রবন্ধে লেখা সম্ভবও নয় এবং তা লেখা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আমি শুধু এখানে তাঁর প্রেম বা প্রেম-জীবন সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিখবো।

ডক্টর জনসন কোনো দিক থেকেই সাধারণ ছিলেন না। তাঁর অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের মত তাঁর প্রেমও বোধহয় ছিল অসাধারণ। সাধারণ মানুষ রূপ ও যৌবনের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট, —রূপ ও যৌবনের জন্য প্রতিনিয়তই পাগল। কিন্তু ডক্টর জনসন কোনো দিনই রূপ-যৌবনের জন্য উন্মাদ হন নি। ভালোবেসে তিনি যাঁকে বিয়ে করেন সেই ভদ্রমহিলা ছিলেন বয়সে তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। দেখতেও তিনি মোটেই সুশ্রী ছিলেন না।

অবশ্য ডক্টর জনসনও সুরূপ ছিলেন না। শোনা যায় তাঁর আচার-ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত রূঢ়। অনেক সময়ই তিনি নাকি মেজাজ ঠিক

রাখতে পারতেন না। তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার জেমস্ বসওয়েল-এর সঙ্গেও তিনি সময় সময় যথেষ্ট রূঢ় আচরণ করতেন। একবার বসওয়েল-এর প্রশ্নবাণে উত্যক্ত হয়ে তিনি নাকি মাটিতে পা ঠুকে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলেছিলেন,—'দেখুন মশাই, এত প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। এটা যে ভদ্রতা নয় তা কি আপনি বোঝেন না? অনবরত এটা কী, ওটা কী, গরুর ল্যাজ কেন লম্বা, শেয়ালের ল্যাজ কেন মোটা,—এসব বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অবশ্য এই ধরনের রূঢ় ব্যবহারে বসওয়েল কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ হন নি। বরং দিনে দিনে ডক্টর জনসন-এর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও মানবিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি আরও বেশী অনুরক্ত হয়েছেন। বলা বাহুল্য ডক্টর জনসনও বসওয়েলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

ডক্টর জনসন-এর বেশবাসের পারিপাট্যও একেবারে ছিল না। ওসব দিকে তার কোনো খেয়ালই থাকতো না। তাছাড়া প্রথম দিকে তাঁর আর্থিক অবস্থাও এত খারাপ ছিল যে ইচ্ছে থাকলেও তাঁর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরার উপায় ছিল না। এক কথায়, সাধারণ মেয়েরা যে-সব জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হন অর্থাৎ রূপ, অর্থ, কেতাদুরস্ত ফিটফাট চেহারা, মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে প্রশংসা করার ক্ষমতা, এসবের কোনোটাই তাঁর ছিল না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, মেয়েদের আকর্ষণ করার মত তাঁর কিছুই ছিল না। তাঁর অসাধারণ মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা সাধারণ মেয়েদের না হলেও তীক্ষ্ণধী বিদুষী নারীকে অনায়াসেই আকর্ষণ করতে পারতো। কিন্তু তাঁর

ভাগ্যে তা প্রথমে হয় নি। তাঁর বয়স যখন তিরিশেরও অনেক কম সেই সময় হেনরি পোর্টার-এর প্রৌঢ়বয়স্কা বিধবা পত্নী এলিজাবেথ পোর্টার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে জনসনও তাঁকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যখন তাঁদের বিয়ে হয় তখন জনসন-এর বয়স প্রায় ছাব্বিশ আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ছেচল্লিশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসন এই বিবাহের ফলে খুবই সুখী হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে এই বিয়েকে প্রকৃত প্রেমের মিলন বলে মনে করতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে জনসন-এর স্ত্রী মোটেই সুশ্রী ছিলেন না। জনসন-এর ছাত্র ও অন্যতম বন্ধু ডেভিড গ্যারিক বলেছেন, জনসন-এর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত মোটা এবং তাঁর ফুলো ফুলো গাল তিনি সর্বদা পুরু রঙ দিয়ে লাল করে রাখতেন। মেকলে-র ভাষায় বলতে গেলে, জনসন-এর স্ত্রী তাঁর মুখে আধ ইঞ্চি পুরু রঙ লাগাতেন। শুধু তাই নয়, প্রৌঢ়বয়স্কা মহিলা হয়েও তিনি নাকি বেশবাসে ও আচার-আচরণে অষ্টাদশী তরুণী সাজবার চেষ্টায় প্রায়শই হাস্যকর হতেন। তবু তাঁর প্রতি কোনো দিন ডক্টর জনসন-এর ভালোবাসা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এবং এই স্ত্রী ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রথম জীবনে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রমও করতে হয়েছে এবং তিনি তা সানন্দেই করেছেন।

স্ত্রীকে জনসন সত্যিই গভীর অনুরাগের সঙ্গে ভালোবাসতেন। স্ত্রীর বিরূপ মন্তব্য ইত্যাদিও তিনি শুধু হেসেই উড়িয়ে দিতেন না, বেশ উপভোগও করতেন। একদিনের ছোটো একটি ঘটনার কথা এখানে বলি।

ডক্টর জনসন খেতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি নাকি কৌতুক করে বলতেন, পৃথিবীর যেখানেই যান না কেন, খাবার প্লেটের চেয়েও ভালো কিছু কোথাও দৃষ্টিগোচর হবে না। বসওয়েল লিখেছেন, খাবার টেবিলে তাঁর আর অন্য কোনো দিকে লক্ষ্য থাকতো না। শুধু খাওয়া। খাওয়াতেই তিনি একেবারে মগ্ন হয়ে যেতেন। এমন ভাবে তিনি খেতেন যে, খাওয়ার সময় তাঁর কপালের শিরা পর্যন্ত ফুলে উঠতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর স্ত্রীর রান্না তেমন ভালো হতো না। প্রায়ই জনসন তাই তাঁর স্ত্রীর রান্নার সমালোচনা করতেন। স্ত্রী তাতে বিশেষ বিরক্ত হতেন, সময়-সময় ক্রুদ্ধও হতেন।

একদিন ডক্টর জনসন খাওয়ার পূর্বে তাঁর অভ্যাসমত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। স্ত্রী বোধহয় পূর্ব হতেই কিছুটা বিরক্ত হয়ে ছিলেন। তাই প্রার্থনা করতে দেখে অধৈর্য হয়ে উত্তেজিতভাবে বলে ওঠেন,—থাক থাক, তোমাকে আর খাদ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। ওসব প্রহসন এখন থাক। এখনই তো বলবে এসব একেবারে অখাদ্য, খাওয়াই যায় না।

এ-কথা শুনে স্ত্রীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে জনসন হো হো করে হেসে ওঠেন। —স্ত্রীর এই ধরনের বাক্যবাণ তিনি খুবই উপভোগ করতেন। তাঁর সব রকমের শাসনও তিনি নীরবে প্রসন্ন মনে সহ্য করতেন। স্ত্রীর শাসনও ছিল খুব। তবু সেজন্য তাঁর মনে কোনোই অভিযোগ ছিল না। বরং স্ত্রীর কথা উঠলে তিনি সব সময়ই প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। বন্ধুরা তাঁকে অন্ধ বলে পরিহাস করলে তিনি নাকি বলতেন,—'কী করি মশাই বলুন, পুরনো রোমান্স পড়ে ওঁর ধারণা হয়েছে স্বামীর সঙ্গে পোষা কুকুরের মত ব্যবহার করাই

হচ্ছে বিধি। —এখন, রাগারাগি করলেই তো কান্না শুরু হবে। আর যে-মেয়েকে ভালোবাসা যায় তাকে সত্যি-সত্যি কাঁদিয়ে কারই বা আনন্দ !'

প্রায় সতেরো বছর তাঁদের এই মধুর বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয় এর পর স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুতে জনসন খুবই শোকগ্রস্ত হন। স্ত্রীর সমাধি-স্তম্ভের উপর জনসন ল্যাটিনে লিখে দেন যে তিনি ছিলেন সুন্দরী, সংস্কৃতিসম্পন্না এবং বিশেষ ধর্মপ্রাণা মহিলা।

স্ত্রী সম্পর্কে জনসন কোনো দিন কারো কাছে এতটুকু অভিযোগ করেন নি। পত্নীর মৃত্যুর আঠারো বছর পরও তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—জীবনের কোনো সৌভাগ্যকেই তিনি এখন আর সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারেন না। কারণ তার অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আর জীবিত নেই।—তাঁদের বিবাহের আংটিটি তিনি নাকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরম সম্পদের মত সযত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।

এই সব তথ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, স্ত্রীকে জনসন কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন। অথচ তাঁর স্ত্রী সুশ্রীও ছিলেন না, বিশেষ মার্জিতরুচিসম্পন্না যে ছিলেন তা-ও মনে হয় না। বয়সেও ছিলেন বিশ বছরের বড়। এই স্ত্রীকে যে তিনি কী করে এত ভালোবেসেছিলেন তা ভাবতেও আমাদের বিস্ময় লাগে। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরও জনসন দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ-কাল তিনি অত্যন্ত নির্মল জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির এতটুকু অসম্মান তিনি কখনো করেন নি। অপর স্ত্রীলোকের মোহময় আকর্ষণ তিনি সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতেন।

একবার ডক্টর জনসন-এর একটি নাটক তাঁর স্টেজ-ম্যানেজার-বন্ধু ডেভিড্ গ্যারিক বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে 'প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই নাটকের মহলার সময় জনসন প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন। বলা বাহুল্য স্টেজের অভ্যন্তরে রিহার্সাল-রুমে তাঁকে স্বল্পবেশা সুন্দরী অভিনেত্রীদেরও সংস্পর্শে আসতে হতো। কা-ভেবে তিনি একদিন তাঁর বন্ধু গ্যারিক-কে বললেন,—'ছ্যাখো ডেভিড্, তোমার এই সুন্দরী অভিনেত্রীরা আমার ভিতরের আদিম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।' সুতরাং আমি আর এখানে আসবো না।'

এবং সত্যিই এর পর থেকে তিনি আর কোনো দিন স্টেজের অভ্যন্তরে যান নি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার থ্রেল্-এর সঙ্গে ডক্টর জনসন-এর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। প্রায়ই তিনি মিস্টার থ্রেল্-এর বাড়ি গিয়ে থাকতেন। তাঁর জন্য মিস্টার থ্রেল্-এর বাড়িতে পৃথক ঘর সজ্জিত থাকতো। ইচ্ছে হলে তিনি যতদিন খুশি সেখানে থাকতেন। মিসেস্ থ্রেল্ তাঁর সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। মিসেস্ থ্রেল্ ছিলেন সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বিশেষ বুদ্ধিমতী মহিলা। জনসন তাঁকে খুবই প্রীতির চোখে দেখতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। একবার জনসন তাঁকে প্রশংসা

করে বলেন,—'দেখুন ম্যাডাম, আমি যত মহিলার সংস্পর্শে এসেছি তার মধ্যে আপনার মত জ্ঞানবুদ্ধি কারো দেখি নি। আপনি কখনো বাজে বকবক করেন না।'—বলা বাহুল্য জনসন-এর মুখের এই প্রশংসা বাক্যের মূল্য কম নয়।

প্রায় ষোলো বছর এই থ্রেল্-পরিবারের সঙ্গে ডক্টর জনসন-এর ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরও মিসেস্ থ্রেল্ তাঁর সঙ্গে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তা ছিলও। কিন্তু হঠাৎ মিসেস্ থ্রেল্ একজন ইতালীয় সঙ্গীত-শিল্পীকে বিবাহ করায় জনসন অত্যন্ত বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও আহত হন। এবং তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। এমন কি তাঁর পূর্বের চিঠিপত্র পর্যন্ত তিনি ভস্মসাৎ করে ফেলেন। একজন বিদেশী ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিলেন বলেই জনসন এতটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, জনসন হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে এই মহিলাকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। সেই জন্যই তাঁর বিবাহ সংবাদে তিনি এত বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হন। যাই হোক, মিসেস্ থ্রেল্-এর সঙ্গে জনসন-এর কথাবার্তা, আচার-আচরণে কিন্তু কোনো দিন এ ধরনের কিছু প্রকাশ পায় নি। যদি এই অনুমান সত্যও হয়, তাহলে এ-কথা বলতেই হবে যে, তাঁর প্রেমের মত তাঁর সংযমও ছিল অসাধারণ।

বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধে যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে তা নরনারীর প্রেম। কিন্তু প্রেমের যে আর এক গভীর ও ব্যাপক অর্থ আছে,—সে-অর্থেও জনসন-এর প্রেম সাধারণ ছিল না। যত রুগ্ন, দরিদ্র ও

নির্যাতিত, সকলের জন্যই তাঁর অন্তরে স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। পথে পড়ে-থাকা অনেক দরিদ্র ও রুগ্ন মানুষকে তিনি সযত্নে,—অনেক সময় নিজে ঘাড়ে করে আপন গৃহে নিয়ে আসতেন। তার পর আশ্রয় দিয়ে, সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে তাদের ভালো করে তুলতেন। অশক্ত পশুপক্ষীও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতো না। তাদেরও তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে গৃহে নিয়ে আসতেন। ফ্লীট স্ট্রীটের উত্তর দিকে তাঁর বাসভবন প্রায় একটা পিঁজরাপোল ও অনাথ-আশ্রমের মত হয়ে উঠেছিল। তাঁর বাড়িতে ঢুকলে প্রথমেই কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, বেরালের মিউ-মিউ, ও কাকাতুয়া প্রভৃতির কর্কশ চিৎকারে অস্থির হয়ে উঠতে হতো। উপরে উঠলেও হয়তো দেখা যেতো কতগুলি বৃদ্ধ অশক্ত নরনারী কী-বিষয় নিয়ে যেন জোর গলায় তর্কাতর্কি করে চলেছে। এরা সকলেই ডক্টর জনসন-এর আশ্রিত। এদের জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রচুর লিখবার আছে। কিন্তু এখানে বিস্তৃতভাবে কোনো কিছুই লেখা সম্ভব নয়। তাই অবশেষে আর একটি বিষয় শুধু সংক্ষেপে লিখে শেষ করি এই প্রবন্ধ। এইতেই আমার মনে হয় তাঁর মানব-প্রেম যে কত গভীর ছিল তা অনায়াসে উপলব্ধি করা যাবে।

অনেকেই হয়তো জানেন, তখনকার দিনে ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও নিগ্রোদের বড় একটা কেউ মানুষ বলে গণ্য করতো না। অথচ সেই সময়ে,—সেই বিশেষ নিগ্রো-বিদ্বেষের দিনেও ডক্টর জনসন বরাবর নিগ্রোদের মানবিক অধিকার স্বীকার করে এসেছেন এবং স্বাধীনতার জন্য তাদের বিদ্রোহও সর্বসমক্ষে সমর্থন করেছেন। তাঁর নিগ্রো-ভৃত্য ফ্রাঙ্ক্-এর সঙ্গে তিনি বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর

প্রায় সব সম্পত্তিই তিনি এই নিগ্রো ভৃত্যকে দিয়ে যান,—যার ফলে, ১৭৮৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ফ্রাঙ্ক্-কে আর কখনো চাকরি করতে হয় নি। পরবর্তী জীবন সে সম্পূর্ণই স্বাধীনভাবে কাটিয়ে গিয়েছে।

এই সব থেকে স্পষ্টই মনে হয় ডক্টর জনসন শুধু অসাধারণ পণ্ডিতই ছিলেন না,—তাঁর প্রেমও ছিল অসাধারণ এবং বলা বাহুল্য তা প্রেমের সর্ববিধ অর্থেই।

Johann Wolfgang Von Goethe 1749 A.D.-1832 A.D.

গ্যেটে

বিশ্ববিখ্যাত কবি গ্যেটে যে অসাধারণ সৃজন-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সে-কথা বিশেষ করে বলাই নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, তিনি দেবদুর্লভ সৌভাগ্যেরও অধিকারী ছিলেন। রূপ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, মেধা, বুদ্ধি ও সৃজনপ্রতিভার এমন আশ্চর্য সমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সর্বতোভাবেই তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ ও অসামান্য। একেবারে শৈশব হতেই নানাভাবে এর সূত্রপাত দেখা যায়। ছ-সাত বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার অদ্ভুত স্ফুরণ হয়। এই বয়সেই তিনি ভগবান, প্রকৃতি ও মানুষের স্বভাব প্রভৃতি জটিল ও গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। মাত্র আট বছর বয়সের সময় তিনি ক্রীশ্চান ও প্যাগানদের জ্ঞানের তুলনা করে ল্যাটিন ভাষায় এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এগারো বছর বয়সের সময় তিনি একটি উপন্যাসই লিখে ফেলেন, এই উপন্যাসটি লিখতে নাকি তাঁর মাতৃভাষা ছাড়া আরো পাঁচ-সাতটি ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, এই অল্প বয়সের মধ্যে তিনি কবিতা রচনা, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, অসিচালনা প্রভৃতিতেও বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন।

বাল্যকাল হতে তাঁর মধ্যে পরিণত মনের লক্ষণও দেখা যায়। এই সময় হতেই তিনি আত্মবিশ্লেষণে অনলস ছিলেন। তার ফলে তাঁর চিত্তের স্বাভাবিক ঔদার্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর অনেক কাজ

ও লেখার মধ্যে তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। মাত্র সতেরো বছর বয়সের সময়ই তিনি সম-অপরাধী নামে যে নাটকটি লেখেন তার উপসংহারে এই মত ব্যক্ত করেন যে আমরা অধিকাংশই যখন নানা অপরাধে অপরাধী তখন অপরের অপরাধ আমাদের ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। কৈশোরে রচিত এই নাটকটি অবশ্য সাহিত্য হিসাবে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু সেই যুগে জার্মানীতে মাত্র সতেরো বছরের ছেলের পক্ষে আন্তরিকভাবে এই উদার ও সহৃদয় মনোভাব পোষণ করা সত্যিই কিছুটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

রেনেসাঁসের মানবতান্ত্রিক সুরটি যেন তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত ন্যায়-নীতির অনেক উর্ধ্বেই যে মানুষের স্থান সে-বিষয়ে সেই অল্প বয়সেই তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। বাল্যকালে একবার তাঁর কয়েকজন সহপাঠী তাঁকে উত্তেজিত করার জন্য বলে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের পুত্র নন। তিনি অন্য কোনো একজন ধনী ব্যক্তির পুত্র।—বলা বাহুল্য এই ধরনের কুশ্রী ইঙ্গিতে যথেষ্ট শিক্ষিত, সংযত ও বয়স্ক ব্যক্তিরও উত্তেজিত হওয়ার কথা। কিন্তু গ্যেটে উত্তেজিত তো হলেনই না, উপরন্তু এর একটি সুন্দর উত্তর দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন,—বেশ তো, যদি তাই সত্যি হয় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ মানুষের জীবন এমনই এক মহা দান যে কোন্ মানুষের কাছ থেকে তা এসেছে সে-কথা সে না ভেবেও পারে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে গ্যেটে শুধু অসাধারণ কবি ছিলেন না। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই

তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা গেছে। সাহিত্যেরও সব শাখাতেই যেন তাঁর সমান অধিকার ছিল। গদ্য, পদ্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস সমস্ত কিছুতেই তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন্। বিপুল ও বিচিত্র তাঁর রচনাবলী। অবশ্য আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর উপন্যাস 'তরুণ ভের্টর-এর দুঃখ', 'ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার' ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'ফাউস্ট'-এর নামই সমধিক পরিচিত। ফাউস্ট গ্যেটের জীবনের বোধহয় সর্বোত্তম সাহিত্যকর্ম এবং এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে আগাস্ট জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে গ্যেটের জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে য়োহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্ গ্যেটে। তাঁর পিতা য়োহান কাস্‌পার গ্যেটে ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর একজন ধনী ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ও শিল্পানুরাগীও ছিলেন। বাল্যকালে গ্যেটে বাড়িতেই পড়াশোনা করেন এবং তাঁর অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির বলে অল্প বয়সের মধ্যেই মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজি, ফরাসী, ল্যাটিন, ইতালীয়, হিব্রু প্রভৃতি আরো অনেকগুলি ভাষাও মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেন।

ষোলো বছর বয়সের সময় তিনি লাইপ্‌ৎসিগ্ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসেন। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল তিনি আইনজীবী হবেন্। গ্যেটের সেটা মনঃপূত ছিল না। তিনি স্থির করেন সাহিত্য অধ্যয়ন করে অধ্যাপক হবেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। লাইপ্‌ৎসিগ্ ইউনিভার্সিটিতে তিনি তাঁর শিক্ষাই সাঙ্গ করতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর ফুসফুস হতে ভীষণ রক্ত উঠতে শুরু করে। এত রক্ত ওঠে যে অনেকে তাঁর জীবনের আশাই পরিত্যাগ

করেন। অবশ্য সেবা ও সুচিকিৎসার গুণে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ পর্যন্ত তিনি রোগমুক্ত হন। তাঁর যে ঠিক কী রোগ হয়েছিল সেটা ভালোভাবে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন তাঁর ক্ষয়রোগ হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠে নি। রক্তপাত হয়েছিল অন্ত্র থেকে। সে যাই হোক, প্রায় দেড় বৎসর তিনি এই কঠিন রোগে ভোগেন।

আরোগ্য লাভের পর ১৭৭০ সালে গ্যেটে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার জন্য আবার স্ট্রাস্‌বুর্গ-এ আসেন। তিনি দেড় বৎসর এখানে কাটান। অতঃপর এখান থেকে তাঁর আইনের ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে তিনি আবার ফ্রাঙ্কফোর্ট-এ তাঁর নিজ বাসগৃহে ফিরে যান। তাঁর পিতার অনুরোধে প্রথম প্রথম কিছুদিন তিনি আইন ব্যবসায়ে বেশ আগ্রহ দেখান। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আইনের প্রতি তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং সাহিত্য স্বষ্টিতেই তিনি প্রায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

১৭৭৫ সালে ডিউক কার্ল আউগুস্ট-এর আমন্ত্রণে গ্যেটে ভাইমার-এ আসেন। তখন তাঁর ছাব্বিশ বৎসর বয়স। পর বৎসর জুনমাসে তিনি ভাইমার-এর রাজদরবারে এক নিম্ন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। সে-সময় তাঁর বেতন স্থির হয় বার্ষিক ১২০০ টালার। দিনে দিনে কার্ল আউগুস্ট-এর সঙ্গে গ্যেটের গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তাঁর বাসের জন্য তাঁকে একটি স্বন্দর বাগান-ঘেরা বাড়িও দেওয়া হয়। এর পর হতে জীবনের অবশিষ্টাংশ গ্যেটে প্রধানত এখানেই কাটান।

যদিও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি গ্যেটের শ্রদ্ধা, ভালো-

বাসা ও আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না তবু মনে হয় তাঁর মনের গহনে রাজরাজড়াদের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি তাঁদের সম্মান দেখাতে ও তাঁদের কাছ হতে সম্মান পেতে খুবই উৎসুক ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অসাধারণ কবিখ্যাতিকে তিনি সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন সন্দেহ নেই; কিন্তু একজন অতি সাধারণ ও সামান্য জার্মান ডিউকের রাজমন্ত্রী বা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হতে পারাটাকেও তিনি কিছুমাত্র কম সৌভাগ্য বলে মনে করতেন না। এদিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এটা বোধহয় অনেক কবিচিত্তেরই সাধারণ দুর্বলতা। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। এটি অস্ট্রিয়ার টেপ্‌লিৎস্‌ শহরে ঘটে। একদিন তিনি ও বিখ্যাত সুরশিল্পী বেটোফন (Bethoven) বেড়াতে বার হয়েছিলেন। তাঁরা যে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই পথে হঠাৎ রাজপরিজনদের কয়েকজনও এসে পড়েন। গ্যেটে তাঁদের দেখামাত্র রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁদের সম্মান দেখান। কিন্তু বেটোফন সম্মান দেখানো দূরের কথা, সেদিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। যেমন হেঁটে যাচ্ছিলেন তেমনি চলে গেলেন। গ্যেটে কিন্তু তাঁদের একেবারে না-যাওয়া পর্যন্ত সেইভাবেই রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেটোফন নাকি এতে খুবই কৌতুক বোধ করেন এবং গ্যেটেকে বেশ দুকথা শুনিয়েও দেন।

অবশ্য এই রকম এক আধটা ঘটনা থেকে গ্যেটে-চরিত্র সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এটা নিছক ভদ্রতা, না, গ্যেটে-চরিত্রের বিশেষ দুর্বলতা তা গ্যেটে সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের পক্ষেই বলা সম্ভব।

যাই হোক, গ্যেটে তাঁর রাজকার্যে প্রচুর সময় ব্যয় করতেন এবং এটাকে তিনি মোটেই সময়ের অপব্যয় বলে মনে করতেন না। কখনো কখনো তিনি এই সব কাজে এমন মগ্ন হয়ে যেতেন যে সাহিত্য সৃষ্টিও তাঁর কাছে যেন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতো। তবে এটাকে তাঁর এই সব কাজের প্রতি বিশেষ আসক্তির লক্ষণ বলে গণ্য করা চলে না। আসলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সময়ে বিকাশের জন্য বিশেষভাবে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। অবশ্য সাহিত্যরচনা কোনো সময়েই একেবারে বন্ধ হয় নি। সেই শৈশব হতে শুরু করে তিরাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য-সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনলস ও অনন্য-সাধারণ। বস্তুত তাঁর প্রায় সমগ্র জীবনই সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে চলেছে তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী বিচিত্র প্রেমলীলা। এ যেন দুটি নদীর মত এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর জীবনে। কতবার যে ভালোবেসেছেন তিনি তার আর ইয়ত্তা নেই। এবং কোনো প্রেমই বোধহয় তাঁর জীবনে একেবারে নিষ্ফল হয়ে যায় নি। প্রতিটি প্রেমের আনন্দ, বেদনা ও যন্ত্রণার ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি তাঁর সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রেমলীলার সঙ্গে সঙ্গে সমানে চলেছে তাঁর নব নব অভিনব কাব্যরচনাও।

জীবনে গ্যেটে যত নারীর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা দেহ বা মনের দিক থেকে তাঁকে সামান্যমাত্রও আকর্ষণ করতে পেরেছেন তাঁদেরই বোধহয় তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন। তবে তিনি যত সহজে ভালোবেসেছেন ঠিক ততটা না-হলেও মোটামুটি সহজেই সেই

ভালোবাসার বন্ধন হতে আবার মুক্ত হয়েও এসেছেন। এটা বোধহয় এক ধরনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এঁদের একান্তভাবে চাওয়াটাও যত সত্য, আবার ছেড়ে যাওয়াটাও তত সত্য। অবশ্য ছেড়ে যেতে তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করেন নি বা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ভুলে গেছেন তা নয়। কিন্তু তবু তিনি একদিন ছেড়ে গেছেন, দূরে সরে এসেছেন এবং আবার নতুন করে ভালোবেসেছেন।

গ্যেটের প্রণয়কাহিনী পাঠ করলে জানা যায় চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সেই তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। এই সময় হতে তাঁর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যাঁদের ভালোবেসেছেন তাঁদের মধ্যে গ্রেট্‌খেন, আনা কাতারীনা, এমিলিয়া, লুসিন্দা, ফ্রীডেরিকা, শার্লোট বুফ্‌, মাক্‌সিমিলিয়ানা, আনা এলিজাবেথ শ্যোনেম্যান এবং ক্রিসতিয়ানার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রিসতিয়ানা-কে কবি পরে বিবাহও করেন।

চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের সময় কবি তাঁর জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফোর্ট-এই থাকতেন। এই সময় একটি দরিদ্র মেয়েকে তিনি অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেন। খুব সম্ভব এইটিই তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম প্রেম। বাল্যকালের প্রেমে যা সাধারণত হয়, মেয়েটি ছিলেন তাঁর চাইতে বয়সে কিছু বড় এবং প্রণয়ও ছিল একতরফা। মেয়েটি দরিদ্র ঘরের হলেও ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। কিন্তু তাঁর নামটা ঠিক জানা যায় না। গ্যেটে আত্মজীবনীতে তাঁর নাম দিয়েছেন গ্রেট্‌খেন। ফাউস্ট নাটকে গ্যেটে এই নাম অমর করে দিয়েছেন।

এর পর আনা কাতারীনার কথা। কবি তখন লাইপ্‌ৎসিগ্‌-এ

এসেছেন পড়াশোনা করার জন্য। বয়স আর তখন কত হবে। সতেরো-আঠেরো বছর হবে বোধ হয়। এই সময় জনৈক হোটেল-ওয়ালার কন্যা আনা কাতারীনার প্রেমে পড়েন তিনি। আনা-দের হোটেলে তরুণ ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ প্রায়ই আসতেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের নিয়ে। এই সূত্রেই তাঁর আনা-র সঙ্গে প্রথম পরিচয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই পরিচয় প্রেমে পরিণত হয়। ঈর্ষাজর্জর হৃদয়দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ এই প্রেমে নাকি কিশোর গ্যেটে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। তাহলে হয়তো তাঁর এই অনুরাগের প্রাবল্য ও হৃদয়যন্ত্রণার কিছুটা অনুভব করা যাবে।—গ্যোটে তখন খুব অসুস্থ। একদিন সন্ধ্যায় তিনি সংবাদ পেলেন আনা তার মায়ের সঙ্গে থিয়েটারে গেছে। শুনেই তাঁর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠলো। তিনি ভাবলেন, হায় ভগবান, আনা যখন জানে সে যাকে ভালোবাসে সে রোগশয্যায় তখন সে থিয়েটারে গেলো কী করে? যেতে ইচ্ছে হলো?—গ্যোটের মনে হলো আনা একেবারেই বিশ্বাসের যোগ্য নয়। নিশ্চয়ই তার অন্য কোনো প্রেমাস্পদের সঙ্গে সে থিয়েটারে গেছে।—এই সময়কার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে গোটে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন,—"এই সংবাদে আমার রক্তে যেন আগুন ধরে গেলো। তাড়াতাড়ি পোশাক পরলাম···আর পাগলের মত ছুটে বার হয়ে গেলাম থিয়েটারে।"

অবশ্য পরে জানা গেলো যে গ্যোটের সন্দেহ অমূলক।—সে যাই হোক, লাইপ্‌ৎসিগ্‌ হতে গ্যোটে চলে আসার পরই এই ঈর্ষাজর্জর উদ্দাম প্রণয়ের অবসান হয়।

বলা বাহুল্য গ্যেটের জীবনের সমস্ত প্রেম-কাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং এরপর একেবারে শার্লোট বুফ-এর কথায় আসা যাক। শার্লোট বুফ-এর কথা একদিক হতে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যও। কারণ এঁর প্রতি গ্যেটের প্রেম ও সেই প্রেমের ব্যর্থতাই নাকি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভের্টর' রচনার প্রধান প্রেরণা।

১৭৭২ সালে গ্যেটে আইনসংক্রান্ত কাজে ভেৎস্‌লার-এ আসেন। এইখানে এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে তাঁর শার্লোট-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। এঁর সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—'ইনি হচ্ছেন সেই জাতীয় নারী যাঁরা পুরুষের অন্তরে বাসনার আগুন জ্বালায় না, শুধু এঁদের দেখে তৃপ্ত হওয়া যায়।"—কিন্তু কবির এই সময়কার চিঠি-পত্র পড়লে বেশ বোঝা যায় যে শার্লোট তাঁর অন্তরে বাসনার আগুনও জ্বালিয়েছিলেন।

শার্লোট ছিলেন জনৈক কেস্‌ট্‌নর-এর বাগ্‌দত্তা। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও শান্তপ্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। ভাবী স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল খাদশূন্য। তাঁর প্রতি গ্যেটের গভীর অনুরাগ তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন। বলা বাহুল্য সব মেয়েই তা পারে। কিন্তু গ্যেটেকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি। এই তরুণ প্রতিভাবান কবিকে তিনি অনাদর করতেন না বরং সমাদরই করতেন। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা হাবভাবে কোনো সময়ই গ্যেটের অনুরাগে অনুমাত্রও ইন্ধন জোগান নি তিনি। গ্যেটেও বুঝেছিলেন শার্লোট-এর কাছ থেকে তিনি কিছুমাত্র প্রশ্রয় পাবেন না। দিনে দিনে তাই হৃদয়-যন্ত্রণা তাঁর বেড়েই চলেছিল। অবশেষে একদিন তিনি কাউকে কিছু না-জানিয়ে ভেৎস্‌লার ত্যাগ করে চলে আসেন। না-এসে

বোধ-হয় উপায়ও ছিল না। এই সময় তাঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তিনি একবার আত্মহত্যার কথাও নাকি চিন্তা করেছিলেন।

কিন্তু, সে যাই হোক, তবু তিনি প্রেমকে একেবারে এড়িয়ে চলতে পারলেন না। আবার তিনি ভালোবাসলেন এবং এবার বোধ হয় আরো গভীর ভাবে।

সেটা ১৭৭৪ সালের কথা। তখন তিনি তাঁর জন্মস্থান ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট-এ থাকেন। জনৈক ধনী ব্যাঙ্ক-মালিকের কন্যা আনা এলিজাবেথ শ্যোনেম্যান-এর প্রেমে পড়লেন তিনি। গ্যেটে তাঁর আত্মচরিতে এর নাম দিয়েছেন লিলি। লিলি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। বৈভবে ও মর্যাদায় তাঁদের পরিবার নাকি গ্যেটে-পরিবারের চেয়েও উচ্চতর ছিল। তরুণ খ্যাতিমান কবি গ্যেটে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন এঁদের বাড়িতে আসেন। তখন লিলি অভ্যাগতদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। গ্যেটে তাঁর বাজনা শুনে এবং তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেসময় লিলির বয়স সতেরো। আর গ্যেটের পঁচিশ। এই অত্যন্ত সুদর্শন উদীয়মান তরুণ কবিকে লিলিরও খুব ভালো লেগে যায়। অচিরেই তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন। কিছুদিন পরে তাঁদের বাগ্‌দানও ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ হলো না। নানা কারণে উভয় পক্ষের অভিভাবকদেরই এ বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য এই বিবাহ না-হওয়ায় গ্যেটে ও লিলি উভয়ই অত্যন্ত আঘাত পান। অবশ্য লিলি শেষ পর্যন্ত গ্যেটের সঙ্গে অ্যামেরিকায় পালিয়ে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু চিরপরিচিত গৃহ ও দেশ ছেড়ে সুদূর অ্যামেরিকায় চলে যেতে গ্যেটে ইতস্তত করেন।

খুব সম্ভব তাঁর প্রকৃতিতে প্রেমের জন্য এতখানি ত্যাগ সম্ভবপর ছিল না। গ্যেটে অবশ্য পরবর্তী জীবনে বলেছেন যে—"তার প্রকৃত প্রেম-পাত্রী একমাত্র লিলিই হতে পেরেছিলেন, আর কেউ নয়।"—তবে অনেকে তাঁর এই উক্তিকে নিছক ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই মনে করেন নি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্যেটের বিবাহ হলো। কিন্তু তা অনেক পরে এবং অন্য আর একজনের সঙ্গে। গ্যেটে সে-সময় ভাইমার-এর মন্ত্রী। একদিন সকালে তিনি বাগানে পায়চারি করছেন, এমন সময় একটি তরুণী তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মেয়েটি তার সাহিত্যজীবী দরিদ্র ভাই-এর চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র নিয়ে এসেছিল। গ্যেটে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন মেয়েটি পূর্ণ যুবতী এবং অত্যন্ত লাবণ্যবতী। তার কমনীয় মুখশ্রী ও যৌবনোচ্ছল দেহসৌষ্ঠব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন মেয়েটির নাম ক্রিস্‌তিয়ানা ফুল্‌পিউস্‌। সে-ও দরিদ্র। বেরটুশের ফুলের কার-খানায় কাজ করে সে জীবিকা অর্জন করে। তার বয়স তখন তেইশ এবং সে কুমারী। কবি অচিরে মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেললেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলেন।

এর দেড় বৎসর পর ক্রিস্‌তিয়ানা গ্যেটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জননী হন। কিন্তু তখনো তিনি কবির বিবাহিতা স্ত্রী নন। এর অনেক পরে ১৮০৬ সালে গ্যেটে তাঁকে বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ করেন। গ্যেটে ক্রিস্‌তিয়ানার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করা সত্ত্বেও কেন যে প্রথমে তাঁকে বিবাহ করেন নি সে-সম্বন্ধে ভালো করে কিছু জানা যায় না।

কেউ কেউ বলেন ক্রিস্তিয়ানা নিজে নাকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত গোটের স্ত্রী হওয়ার অধিকার চান নি। তিনি নিজেকে নাকি সে-সম্মানের যোগ্য মনে করতেন না। সেইজন্যই বিবাহে এই বিলম্ব ঘটে। কিন্তু ভালোভাবে বিবেচনা করলে এ-যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। কারণ গ্যেটের ক্রিস্তিয়ানা-কে প্রথম থেকেই স্ত্রীর সম্মান দেওয়ার ইচ্ছা প্রবল থাকলে ক্রিস্তিয়ানার এই হীনমন্যতা বিবাহের কোনোরূপ বাধা হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং সঙ্গতভাবেই অনুমান করা হয়, যে-কোনো কারণেই হোক, প্রথমে এই বিবাহে গ্যেটের নিজেরই কোনোরূপ সংকোচ বা অনিচ্ছা ছিল। তবে এ-কথা নিশ্চিত যে প্রথম হতেই ক্রিস্তিয়ানার প্রতি গ্যেটের প্রেম গভীর ও খাদশূন্য ছিল।' তাঁর সঙ্গ ও তাঁর প্রতি অকৃত্রিম প্রেমাবেগের প্রেরণাতেই তিনি তাঁর অপূর্ব আদিরসাত্মক কাব্য 'রোমান এলিজিস্' রচনা করেন। গ্যেটে ও ক্রিস্তিয়ানার দাম্পত্য জীবনও অত্যন্ত সুখের হয়েছিল।

কিন্তু ক্রিস্তিয়ানার সঙ্গে মিলনের পরও গ্যেটের জীবনে আরো বহুবার প্রেম এসেছে। আরো বহু নারীকে ভালোবেসেছেন তিনি। এই সময় হতে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি যাঁদের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মিনা, মারিয়ানা, উল্রিকা, এবং মাদাম সীমানোভ্স্কার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মিনা-কে কবি তার ছেলেবয়স হতে জানতেন। মিনা হার্ৎস্লিব ছিল য়েনার এক পুস্তক ব্যবসায়ীর পালিতা কন্যা। গ্যেটে তাদের গৃহে মাঝে মাঝে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মিনা যৌবনপ্রাপ্ত হলে কবি তাঁর প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন এবং ক্রমে তাঁর

মনে গভীর প্রেমাবেগের সঞ্চার হয়। মিনাও নাকি প্রৌঢ় কবির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাঁদের এই প্রেম অবশেষে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে মিনা-কে শেষ পর্যন্ত গৃহ হতে সরিয়ে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং এইভাবে তাঁরা এই অবৈধ প্রণয়-পরিণতির হাত হতে উভয়ই রক্ষা পান। এই সময়ে মিনা-কে উদ্দেশ্য করে কবি অনেকগুলি সনেট লেখেন। আবেগ, আন্তরিকতা ও পদলালিত্যের জন্য সেগুলি নাকি সবিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।

এরপর মারিয়ানার কথা। দীর্ঘকাল পর ১৮১৪ সালে কবি তাঁর জন্মস্থান ফ্রাঙ্কফোর্ট অঞ্চলে একবার বেড়াতে আসেন। সেখানে তাঁর পুরাতন বন্ধু ভিলেমর-এর আগ্রহে তাঁর গৃহে কয়েক সপ্তাহ তিনি যাপন করেন। এইখানেই তাঁর মারিয়ানার সঙ্গে পরিচয় হয়। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের সময় মারিয়ানা ফ্রাঙ্কফোর্টের স্টেজে অভিনয় করতেন। কলারসিক বিপত্নীক ভিলেমর এই রূপসী তরুণীকে তাঁর নিজ গৃহে কন্যাদের সঙ্গে রেখে লালন করেন। অবশেষে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় তিনি উনত্রিশ বৎসরের এই যুবতী মারিয়ানা-কেই বিবাহ করে ফেলেন। গ্যেটে এই বিবাহে নাকি সে-সময় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিবাহের পর বৎসর তিনি আবার ভিলেমর-এর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ই মারিয়ানার সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর হয় এবং তাঁরা উভয়ই উভয়ের বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তবে, গ্যেটের প্রকৃতি ও সংযমকে ধন্যবাদ, এই নিষিদ্ধ অনুরাগের ফলে যথারীতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় নি। কিছুকাল পর ভবিষ্যৎ

অশান্তির আশঙ্কায় গ্যেটে চিরদিনের জন্য ভিলেমর-এর গৃহ ত্যাগ করে চলে আসেন।

বৃদ্ধ বয়সে গ্যেটের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রণয়পাত্রী হচ্ছেন উনিশ বৎসরের তরুণী উল্‌রিকা। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন গ্যেটের বয়স চুয়াত্তর। তিনি তখন মৃতদার। কয়েক বৎসর পূর্বে ক্রিস্‌তিয়ানার মৃত্যু হয়েছে। এই সময়, ১৮২৩ খৃস্টাব্দে, গ্যেটে মারীনবাড-এ একবার বেড়াতে আসেন। এইখানেই তাঁর পরিচিত লেফেৎসোভ পরিবারে উল্‌রিকার সঙ্গে পরিচয়। উল্‌রিকা যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর কুঞ্চিত কেশ ও নীল চোখে এমন একটা মায়া ছিল যা কবিকে অপূর্ব এক রহস্যময় শক্তিতে আকর্ষণ করতো। অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উল্‌রিকা-কে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন। অনেকের মতে গ্যেটের একুশ বছর বয়সে ফ্রীডেরিকার প্রতি প্রেম যতটা প্রবল হয়ে উঠেছিল চুয়াত্তর বৎসর বয়সে উল্‌রিকার প্রতি এই প্রেম তার চেয়ে কিছু কম প্রবল হয় নি। দূরে রাস্তায় উল্‌রিকার গলার স্বর শুনলেই নাকি তিনি তাড়াতাড়ি ঘর হতে ছুটে বার হয়ে আসতেন।

শেষপর্যন্ত গ্যেটে উল্‌রিকা-কে বিবাহ করবেন স্থির করেন। এই বয়সে তাঁর বিবাহে তাঁর চিকিৎসকেরও নাকি অমত ছিল না। স্বয়ং ডিউক কার্ল আউগুস্ট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উল্‌রিকার মায়ের কাছে যান। উলরিকার জননী প্রথমে এটাকে তামাশা বলে মনে করেন। চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক রাজমন্ত্রী ও রাজকবি গ্যেটে যে উনিশ বছরের তরুণী উল্‌রিকা-কে সত্যিই বিবাহ করতে ইচ্ছুক এটা তিনি প্রথমে

বিশ্বাস করতেই পারেন নি। পরে যখন এর সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হলেন তখন এই অদ্ভুত প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য কিছুদিনের সময় চাইলেন তিনি।

গ্যেটে এতে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন। বিবাহে সামান্য বিলম্বও বোধহয় তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি কিছুদিনের জন্য ভাইমার-এ চলে এলেন। কিন্তু এখানে এসে দেখলেন এই বিবাহে শুধু বিলম্বের আশঙ্কাই নয়, প্রবল বাধারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর এ বিবাহে বিশেষ অনিচ্ছা। উত্তরাধিকারের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর পুত্র নাকি তাঁর সঙ্গে রীতিমত অভদ্র ব্যবহারই শুরু করে দেন।

এই দিক থেকে যে এই রকম বাধা আসবে কবি বোধহয় তা পূর্বে আশঙ্কা করেন নি। এই প্রবল প্রেমাবেগ সংযত করা কিন্তু তাঁর পক্ষে মারাত্মক হলো। তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসকরা তাঁর জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘদিন ভুগলেন তিনি। তারপর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন।

গ্যেটের জীবনের একেবারে শেষ উল্লেখযোগ্য প্রণয়পাত্রী বোধহয় মাদাম সীমানোভ্‌স্কা। সীমানোভ্‌স্কা ছিলেন জাতে পোল। তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতেন এবং সুন্দরীও ছিলেন অসাধারণ। তাঁর সঙ্গীত ও সাহচর্যে কবি অপরিসীম আনন্দ পেতেন। তখনো তিনি উল্‌রিকার প্রেমে বিহ্বল ও বিপন্ন। এই সময় মাদাম সীমানোভ্‌স্কার সঙ্গ তাঁকে অশেষ শান্তিদান করে। এঁকে উদ্দেশ্য করেও কবি একটি

অপূর্ব কবিতা লেখেন। তার নাম দেন তিনি প্রায়শ্চিত্ত। এঁর ব্যক্তিত্ব ও সঙ্গীতের স্পর্শে কবি আবার স্বপ্রতিষ্ঠার আনন্দ ফিরে পান বলেই বোধহয় এই নাম দেন তিনি।

মনের দিক হতে গ্যেটে বোধহয় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর যৌবনকে হারান নি। দেহও তাঁর বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে জরার আক্রমণকে প্রতিহত করে গেছে। বস্তুত, দেহ-মনে প্রায় চিরদিনই তাঁর যৌবন অটুট ছিল। তাই কৈশোরের প্রারম্ভ থেকে সেই বৃদ্ধকাল পর্যন্ত তাঁর জীবনে অজস্র প্রেম এসেছে এবং গেছে। যৌবনের ধর্ম ই বোধহয় এই। সহজেই সে ভালোবাসে, ভালো না-বেসে পারে না, ভালোবাসার তৃষ্ণায় সে সর্বদা আকুল। কিন্তু যেমন সহজে সে ভালোবাসায় মত্ত হয়, তেমনি সহজে সে বিচ্ছেদ ও যন্ত্রণার সমুদ্র পার হয়েও আসতে পারে। জীবনের নতুন ক্ষেত্রে আবার নিজেকে প্রসারিত করতেও সক্ষম সে। সে-শক্তি তার অন্তরে আছে। গ্যেটের জীবনেও দেখা যায় বারবার তাই ঘটেছে। বারবার তাঁর প্রেম এসে তাঁকে অনির্বচনীয় আনন্দ দিয়েছে, দিয়েছে বিপুল বেদনা আর দিয়ে গেছে অনিন্দ্য কাব্য-রচনার অনুপ্রেরণা।

একেবারে শেষের দিকে গ্যেটের শরীর সামান্য কিছু অপটু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মন তাঁর চিরদিনই ছিল যুবকের মত সতেজ ও বিস্ময়কর সৃষ্টিশক্তিতে সমৃদ্ধ। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সমাপ্ত করেন। ১৮৩১ সালে 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়। এর পরের বছর ১৬ই মার্চ ঠাণ্ডা লেগে তিনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার এসে যথাযথ ব্যবস্থা দেওয়ায় ১৭ই মার্চ তিনি বেশ ভালো বোধ করতে থাকেন। সেক্রেটারীকে দিয়ে একটি

দীর্ঘ চিঠিও লেখান তিনি। কিন্তু উনিশ তারিখে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুদিন পর আবার কিছুটা সুস্থবোধ করতে লাগলেন। সকালে ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ.কত তারিখ ?

ভৃত্য বিনীতভাবে বললে, আজ বাইশে।

—ও, বসন্ত তা হলে শুরু হয়ে গেছে। হয়তো এর ফলে এবার ভালো হয়ে উঠবো।

তিনি তাঁর বিছানার পাশের আরাম কেদারাটায় বসলেন। একটু ঘুমের মত এলো তাঁর। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। এর পর তাঁর আর জ্ঞান হয় নি। সেই জ্ঞানহীন অবস্থাতেই তিনি একবার বললেন,—"খড়খড়িগুলো খুলে দাও, আরো আলো আসুক।"—এই হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত 'আরো আলো' উক্তি।"

কিছু কিছু ভুল বকতে লাগলেন তিনি। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর নার্স ঠোঁটে আঙুল দিয়ে জানালেন কেউ যেন গণ্ডগোল না-করেন, কবি নিদ্রিত হয়েছেন।

কিন্তু সে-নিদ্রা আর ভাঙলো না। সেই তাঁর শেষনিদ্রা ও মহানিদ্রা।

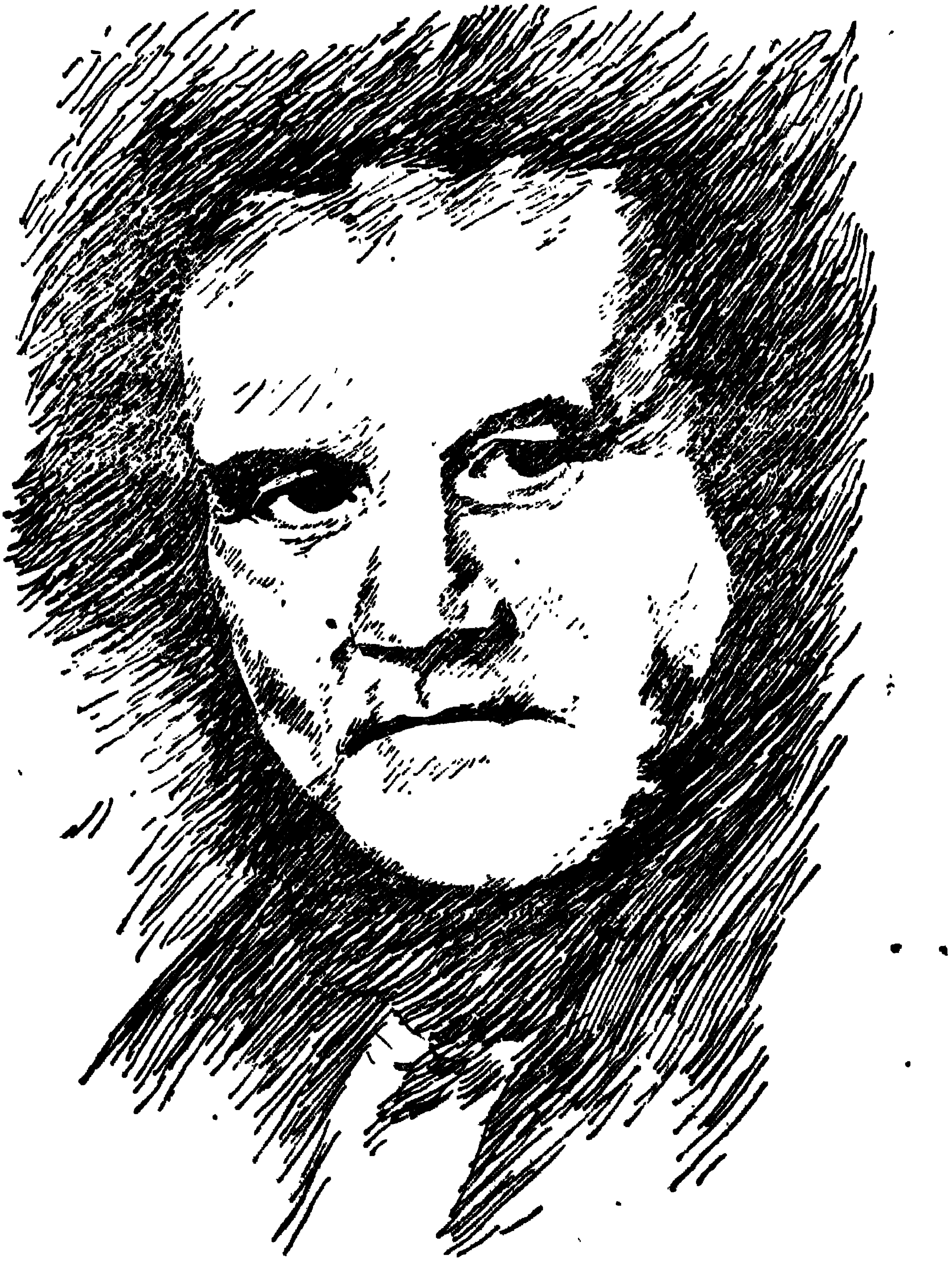

STENDHAL [Henri-Marie Beyle] 1783 A.D.-1842 A.D.

স্তঁাদাল

সুখ চাইলেই কি সুখ পাওয়া যায়? সুখের পিছনে ছুটলেই কি সুখকে ধরা যায়?—না, যায় না। একথা আমরা সকলেই বুঝি। তবু অনেকেই আমরা সারা জীবন সুখের পিছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত ও করুণ, ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত। এভাবে যে সুখ পাওয়া যায় না তা আমরা বুঝেও বুঝি না। আমাদের অনেকের মতই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক স্তঁাদাল-ও বোধহয় বোঝেন নি। ম্যাথ্যু জোসেফ্‌সন স্তঁাদাল-এর যে জীবনী লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'স্তঁাদাল অথবা সুখের অন্বেষণ।' এবং আমাদের মনে হয় তাঁর জীবন-কথার এই নামকরণ সঙ্গতই হয়েছে।

স্তঁাদাল-এর লেখার সঙ্গে আমাদের দেশের যথেষ্ট শিক্ষিত ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণের পরিচয় অল্পই আছে। তাঁর প্রধান প্রধান পুস্তক আমাদের দেশে অনূদিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ ইওরোপে রসিক সমাজে তাঁর লেখা বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর নিজ দেশে তিনি অন্যতম সাহিত্যগুরু বলে বিবেচিত। জোলা বলেছেন, উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী ধারা-সৃষ্টির তিনিই হচ্ছেন জনক। বুর্জে (Bourget) ও আঁদ্রে জিদ্‌-এর মতে তিনিই প্রথম সত্যিকার মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনা করেন।

স্তাঁদাল কিন্তু জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। তাঁর জীবিতকালে তিনি লেখক হিসাবে সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের সময় প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক 'দ্য লামুর' (De l' Amour) সমালোচক এবং জনসাধারণ—কারো দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় নি। দীর্ঘ এগারো বছরে মাত্র সতেরো কপি এই বই বিক্রি হয়েছিল। তাঁর প্রায় শেষ বয়সের লেখা 'ল্য রুজ্ এ ল্য নোয়ার' (Le Rouge et le Noir) ও 'লা শার্ৎর‍্যজ্ দ্য পারম্' (La chartreuse de Parme)—যা পরবর্তীকালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে,—তাঁর জীবদ্দশায় দেশে তেমন কোনোই সাড়া জাগাতে পারে নি। অবশ্য বালজাক স্তাঁদাল-এর জীবিতকালেই তাঁর "লা শার্ৎর‍্যজ্ দ্য পারম্'-এর প্রশংসা করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে অনেকে মনে করেন স্তাঁদাল বালজাককে যে তিন হাজার ফ্রাঁ ধার দিয়েছিলেন সেই ঘটনাই এই প্রবন্ধ-রচনার মূল প্রেরণা।—সে যাই হোক, বালজাক-এর এই প্রবন্ধও কিন্তু স্তাঁদাল-কে তাঁর সমকালে খ্যাতি দান করতে পারে নি। ১৮৪২ সালে স্তাঁদাল-এর যখন মৃত্যু হয় তখন পারী-র দুটি কাগজে মাত্র এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বন্ধু মেরিমেয়-কে নিয়ে মাত্র তিনজন লোক বোধহয় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্তাঁদাল-এর খ্যাতি হয় তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। জীবিতকালেই যাঁর নাম বড় একটা কেউ জানতো না, মৃত্যুর পর তিনি প্রায় সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছিলেন। অনেককাল পরে ইপলিৎ ত্যেন (Hippolyte Taine) তাঁর সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি

বিশেষ করে স্তাঁদাল-এর গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পর্যালোচনা ও প্রশংসা করেন। ত্যেন-এর এই প্রবন্ধের পর স্তাঁদাল সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হয়। এবং অতঃপর তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ তিনজন ঔপন্যাসিকের অন্যতম বিবেচিত হন।

ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সমকালে স্তাঁদাল-এর ব্যর্থতার কারণ বোধহয় তাঁর গল্পবলার শক্তির অভাব। স্তাঁদাল একেবারেই গল্প বানাতে পারতেন না। তাঁর উপন্যাসের প্লট বা গল্প তিনি সাধারণত অপরের বই থেকে অথবা সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করতেন। তাছাড়া সেটা ছিল রোমান্টিসিজ্‌মের যুগ। স্তাঁদাল যদিও রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্রভাব এড়াতে পারেন নি, তা হলেও স্বভাবত তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁর তীক্ষ্ণ তির্যক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ তখনকার দিনে সম্যক সমাদৃত না-হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর ভাষাও ছিল অত্যন্ত সংযত ও সাদামাটা। ভাষায় অলঙ্করণ তিনি একেবারে পছন্দ করতেন না। বলা বাহুল্য, এটা সাধারণের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত নয়। এর উপর সাধারণ পাঠককে ঔপন্যাসিকের যে-গুণ সর্বাধিক আকৃষ্ট করে সেই গল্প-রচনার দুর্বলতা তো তাঁর ছিলই।

কিন্তু গল্প-রচনায় তাঁর যত দুর্বলতাই থাক, মানব-মনের গলিঘুঁজি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম; বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া তাঁর মৌলিকতাও ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। স্তাঁদাল-এর রচনার দোষগুণ যা-ই থাকুক, তাঁর লেখা যে এক সময় সমাদৃত ও কালজয়ী হবে সে বিষয়ে তাঁর নিজের কিন্তু কোনো সংশয় ছিল না। এবং বলা বাহুল্য তাঁর সে বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছে।

স্তঁদাল-এর প্রকৃত নাম হচ্ছে আঁরি ব্যেল্ (Henri Beyle)। ১৭৮৩ সালে গ্রানব্‌ল্‌-এ (Grenoble) এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন অ্যাটর্নি এবং শহরের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। মাত্র সাত বছর বয়সে স্তঁদাল তাঁর মাকে হারান। স্তঁদাল লিখেছেন তিনি তাঁর মাকে একজন তরুণ প্রেমিকের মতই তীব্রভাবে ভালোবাসতেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর বাবা ও মাসীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মানুষ হন। তাঁর বাবার শাসন খুব কড়া ছিল। ছেলেবেলায় তিনি যে-কোনো বই পড়তে বা যার-তার সঙ্গে মিশতে পারতেন না। স্তঁদাল তাঁর বাবাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। এত অপছন্দ করতেন যে তাঁর বাবার সঙ্গে কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য থাকাটাও তিনি লজ্জাকর মনে করতেন। তাঁর বাবা রাজতন্ত্রের ভক্ত হওয়াতে তিনি নিজেকে মনে করতেন রিপাব্‌লিকান।

সৈন্য-বিভাগে কেরানীর কাজ নিয়ে স্তঁদাল তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু সে-কাজ তিনি বেশীদিন করেন নি। অল্পদিন পরেই পদত্যাগ করে তিনি পারী-তে এসে বাস করতে থাকেন। দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পারী-তে আসেন। একটি হচ্ছে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-নাট্যকার হওয়া এবং অপরটি হচ্ছে সে-কালের প্রখ্যাত প্রেমিক হবেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনোটারই উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক ঐশ্বর্য তাঁর ছিল না। তাঁর কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অভাবের জন্য সফল কবি-নাট্যকার হওয়া তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। অপর দিকে প্রেমের ব্যাপারে সফল হওয়ারও তাঁর অনেক বাধা ছিল। তিনি মোটেই সুপুরুষ ছিলেন না। কুশ্রীই বলা চলে তাঁকে। তিনি ছিলেন

খর্বকায় ও স্থূল। এর উপর শরীরের অনুপাতে বিরাট একটি মাথা ও মোটা নাক। বলা বাহুল্য এই দেহ রমণীহৃদয় বিগলিত বা তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মত মোটেই নয়। এ ছাড়া আরো একটি কথা। স্তাঁদাল-এর প্রেম ছিল প্রধানত মস্তিষ্কজাত উদ্দেশ্যমূলক—হৃদয়-উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত বেহিসাবী প্রেমাবেগ তাঁর ছিল না। প্রেমে সফলতা চাইতেন তিনি নিজের সুখ ও অহং-তৃপ্তির জন্য,—নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, এ ধরনের প্রেম সাধারণত তরুণীহৃদয় স্পর্শ করে না। তবে একটি জিনিস স্তাঁদাল-এর ছিল, তা হচ্ছে যথেষ্ট অর্থ। এর জন্যই বোধহয় প্রেমের বাহ্যিক ব্যাপারে তিনি কিছু-কিছু সফলতা অর্জন করেছিলেন।

যাই হোক, পারী-তে এসে প্রথমে তাঁর একটি সাধারণ অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। কিছুদিন ইতস্তত করে এঁরই প্রেমে পড়ে যান তিনি। ইতস্তত করার কারণ তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে অভিনেত্রীটির হয়তো যৌনরোগ আছে। পরে অবশ্য সে-সন্দেহ দূর হয়। এঁর সঙ্গে তিনি মারসেয়-তে (Marseilles) চলে আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হতাশার সঙ্গে অনুভব করেন যে, যে-নারীর স্বপ্ন তিনি দেখে থাকেন তার মত ধী, শ্রী বা আত্মিক সম্পদ কোনোটাই এই রমণীর নেই। সুতরাং অভিনেত্রীটি যখন আবার পারী-তে ফিরে গেলেন স্তাঁদাল সত্যি-সত্যি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

এরপর স্তাঁদাল তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় মসিয়ে দারু-র (Daru) সহায়তায় আবার সৈন্য-বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮১০ সালে পদোন্নতি লাভ করে তিনি পুনর্বার পারী-তে ফিরে আসেন। পারী-র

শহরতলীতে একটি কোরাস-গার্লকে নিয়ে তিনি বাস করতেন। কিন্তু এতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তাঁর একজন প্রণয়িনীর প্রয়োজন। কে সেই প্রণয়পাত্রী হবেন? অনেক চিন্তা করে তিনি মসিয়ে দারুর স্ত্রী মাদাম দারু-কে মনোনীত করলেন। মাদাম দেখতে সুন্দরী ছিলেন এবং বয়সেও ছিলেন তাঁর স্বামীর চেয়ে অনেক তরুণ। স্তাঁদাল নানাভাবে তাঁকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মাদাম তাঁকে একেবারেই পাত্তা দিলেন না এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার তাঁর কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই।

এই ব্যর্থতা স্তাঁদাল-এর অহমিকায় বিশেষ আঘাত দেয়। কিছুদিনের জন্য তিনি ছুটি নিয়ে ইতালীর মিলান-এ চলে আসেন। দশবছর পূর্বে এখানে তিনি একজন সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী জনৈকা জিনা পিয়েত্রাগ্রুয়া-র সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সে-সময় স্তাঁদাল ছিলেন সামান্য ডেপুটি-লেফ্টেনাণ্ট। সুতরাং, স্বাভাবিক কারণেই, জিনা তাঁর প্রতি কোনো মনোযোগ দেন নি। কিন্তু এখন তিনি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। স্তাঁদাল মনে করলেন যে এখন তাঁর আশা আছে। তিনি জিনা-কে খুঁজে বার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। জিনা অবশ্য তাঁর মেয়েলী স্বভাববশত, তাঁকে বেশ কিছুদিন নাচালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁকে তাঁর শয়নকক্ষে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। সেদিন ২১শে সেপ্টেম্বর। স্তাঁদাল তাঁর ডায়েরী-তে লিখেছেন,—অবশেষে আমি বিজয়ী হলাম।

ছুটি শেষ হতে স্তাঁদাল আবার পারী-তে ফিরে এলেন।

এরপর স্তঁাদাল-কে অনেক 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা' অতিক্রম করতে হয়। এই সময় নেপোলিয়ান তাঁর বিখ্যাত রাশিয়া-অভিযান শুরু করেন। স্তঁাদাল সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে মস্কো পর্যন্ত যান এবং সেই মহা বিপর্যয়কর পশ্চাদ্-অপসরণের সময় যথেষ্ট সাহস, ধৈর্য ও মনোবলের পরিচয় দেন। দুপাশে অসংখ্য মৃত্যু দেখতে দেখতে স্তঁাদাল সর্বস্ব খুইয়ে অবশেষে অর্ধমৃত অবস্থায় একদিন পারী-তে ফিরে এলেন।

অতঃপর ১৮১৪ সালে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করলেন। স্তঁাদাল বুরবনদের অধীনে চাকরি করতে নাকি অস্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করে আবার মিলান-এ চলে আসেন। যদিও তখনো তাঁর যথেষ্ট অর্থবল ছিল কিন্তু বলা বাহুল্য সেই পদমর্যাদা আর ছিল না। সেইজন্যই বোধহয় জিনা তাঁকে আর পূর্বের মত সাদরে গ্রহণ করলেন না। স্তঁাদাল নানাভাবে তাঁর প্রেম জাগাতে সমর্থ না হয়ে অবশেষে সোনার কাঠিটা ছোঁয়ালেন। অর্থাৎ তিন হাজার ফ্রঁা জোগাড় করে জিনা-কে দিলেন। এর ফলে পুরাতন প্রেম পুনর্বার জাগরিত হলো।

অতঃপর জিনা-র মা ও ছেলেকে নিয়ে সদলবলে তাঁরা ভেনিসে বেড়াতে গেলেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তাঁরা আবার মিলান-এ ফিরে আসেন। জিনা জানিয়েছিলেন যে তাঁর স্বামী স্তঁাদাল-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত। সুতরাং তিনি যেন শহরতলীতে আত্মগোপন করে থাকেন এবং তাঁর সংকেত পেলে তবেই তাঁর ঘরে আসেন। স্তঁাদাল তাই করতেন। জিনা-র পরিচারিকা গোপনে তাঁকে জিনা-র শয়নকক্ষে নিয়ে যেতেন। কিন্তু একদা জিনা-র সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার জন্যই বোধ-হয় পরিচারিকা স্তঁাদাল-কে জানায় যে মাদাম-এর স্বামী মোটেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত নন। আসলে স্তঁাদাল-এর মত অনেক প্রেমিক মাদামের

আছে। এই কথার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সে স্তাঁদাল-কে জিনা-র শয়নকক্ষের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে রাখে। সেই চোরা-কুঠরির একটি ফুটো দিয়ে মাত্র তিন ফুট দূর থেকে স্তাঁদাল জিনা-র বিশ্বাসঘাতকতা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু তিনি কোনো রকম অসংযত ব্যবহার করলেন না। যেমন গোপনে সেখানে গিয়েছিলেন তেমনি গোপনেই সেখান থেকে বার হয়ে এলেন।

অবশ্য, বলা বাহুল্য, এর ফলে তিনি খুবই মর্মাহত হন। প্রায় আঠারো মাস তিনি নাকি একেবারে কিছু লিখতে পারেন নি।

যাই হোক, ১৮১৮ সালে তিনি আবার সুন্দরী যুবতী জনৈকা কাউন্টেস দেমব্রউস্কির প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু কাউন্টেসের কাছ থেকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় পেলেন না। এর উপর তাঁর নিজের নির্বুদ্ধিতায় শেষ পর্যন্ত এ প্রেম সম্পূর্ণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অবশেষে কাউন্টেস দ্য ক্যুরিয়াল-এর (Countess de Curial) কথা। ১৮২১ সালে স্তাঁদাল মিলান থেকে আবার পারী-তে ফিরে আসেন। এখানেই ক্লেমাতিন দ্য ক্যুরিয়াল-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মাদাম দ্য ক্যুরিয়াল-এর বয়স তখন ছত্রিশ এবং স্তাঁদাল চল্লিশের উর্ধ্বে। মাদাম বেশ সুন্দরী ছিলেন। স্তাঁদাল-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সরস রসিকতা তাঁকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। স্তাঁদাল-এর প্রেম-প্রস্তাব এবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হয়। কিছুদিন উদ্দাম প্রেমলীলায় তাঁদের কাটে। একবার কাউন্টেস-এর গৃহে তাঁরা যখন প্রেমচর্চায় রত সেই সময় হঠাৎ কাউন্টেস-এর স্বামী সেখানে এসে পড়েন। কাউন্টেস তাড়াতাড়ি স্তাঁদাল-কে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে লুকিয়ে ফেলেন। তিন

দিন স্তাঁদাল মাটির নীচে সেই অপরিসর কক্ষে বন্দী থাকতে বাধ্য হন। মাদাম গোপনে তাঁকে খাবার পাঠাতেন এবং মধ্যরাত্রে সকলে নিদ্রিত হলে সেখানে যেতেন।

কিন্তু এই প্রেমও স্থায়ী হলো না। কিছুকাল পরে মাদামের অন্যান্য সব প্রেমিকদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়াবিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং তিনি স্তাঁদাল-কে পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করেন।

আঘাত, আঘাত, আবার আঘাত। দুঃখিত, মর্মাহত স্তাঁদাল সরকারী কাজে অন্যদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রোমে থাকা-কালীন একান্ন বছর বয়সে তিনি আবার তাঁর ধোপানীর তরুণী কন্যার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হলেন। কিন্তু তবু তিনি সুখ ও প্রেমের আশা ছাড়লেন না। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি তার পিছনেই ছুটে বেড়িয়েছেন।

অবশেষে ১৮৪২ সালের মার্চ মাসে একদিন পারী-র রাস্তা দিয়ে যখন স্তাঁদাল হেঁটে আসছিলেন হঠাৎ তাঁর অ্যাপোপ্লেকটিক স্ট্রোক হয়। এটা দ্বিতীয় স্ট্রোক। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় সকলে গৃহে নিয়ে আসেন। পরদিন সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এইভাবে স্তাঁদাল-এর আটান্ন বছরের জীবনের অবসান হলো। বলা বাহুল্য সুখের আশায় তিনি সারা জীবন প্রেমের অন্বেষণ করে গেছেন। কিন্তু প্রকৃত সুখ ও প্রেম কোনোটাই বোধহয় তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। স্তাঁদাল বোধহয় জানতেন না কিংবা জেনেও বুঝতে চাইতেন না যে যারা 'সুখের লাগি চাহে প্রেম' তাদের প্রেম মেলে না এবং সুখও চলে যায়।

John Keats 1795 A.D.-1821 A.D.

জন কীটস

কীটস তখন ইতালী-তে। মৃত্যু শয্যায়। একদিন রাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁর বন্ধু সেভার্ন-কে অনুরোধ করলেন, তাঁর সমাধিস্তম্ভের ওপর যেন এই কটি কথা লিখে দেওয়া হয়ঃ 'হীয়ার লাইজ ওআন হুজ নেম ওআজ রিট ইন ওআটার।'

বলা বাহুল্য এ গভীর অন্ধকারের কণ্ঠস্বর, বুক-ভাঙা নৈরাশ্যের আর্তনাদ। এ সত্য নয়, একেবারে সত্য নয়। কিন্তু কী দুঃখের কথা, তার কাছে তখন এটাই সত্য ছিল। তিনি যে ইতিমধ্যেই আশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং সবার অলক্ষ্যে তাঁর নাম যে সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে তা তিনি অনুভব করতে পারেন নি। সেই দুঃখ, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের দিনে তা অনুভব করাও বোধহয় সম্ভব ছিল না। অবশ্য তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সত্যিই মনে করতেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাম অবশ্যই ইংরেজ কবিদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তখন বোধহয় তিনি ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর জীবন এত শীঘ্র ক্ষয় হয়ে যাবে। তাছাড়া পরবর্তীকালে সাহিত্য-জীবনে বারবার বাস্তব অসাফল্য, তাঁর কবিতার কুৎসিত ও কঠোর সমালোচনা এবং সর্বোপরি তাঁর নিজের দারুণ অসুস্থতা তাঁর বিশ্বাসের মূল বোধহয় কিছুটা শিথিল করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু

সেই নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও অসুস্থতার মধ্যেও তিনি মনে করতেন, যদি আর কিছুকাল বাঁচেন তা হলে তিনি নিশ্চিত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কয়েকজন গুণগ্রাহী উদারহৃদয় বন্ধু ছাড়া এই পৃথিবী কীটস-এর প্রতি সদয় ছিল না। হৃদয়হীন মানুষ বারবার তাঁর গভীর সংবেদনশীল মনে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েছে। তাছাড়া প্রায় জন্মের পর হতেই দুর্ভাগ্য তাঁকে যেন বন্য জন্তুর মতই তাড়া করে ফিরেছে। তাই রোগে, দুঃখে ও হতাশায় মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই অত্যাশ্চর্য প্রতিভার আশ্চর্য জীবন শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী যুগের মানুষ সে-কথা বারবার ভেবেছে আর এই হতভাগ্য কবির জন্য অশ্রু মোচন করেছে। সকলেই আক্ষেপ করেছেন, আহা, কীটস যদি আর কিছুদিন বাঁচতেন! পরবর্তী কালে টেনিসন তাঁকে ওআর্ডসওআর্থ, কোলরিজ, বায়রন, শেলী —সকলের উপরে স্থান দিয়েছেন। টেনিসন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'তিনি বেঁচে থাকলে আমাদের সকলের চেয়ে বড় হতেন।' রসেটি বলেছেন, 'তাঁর সমসাময়িক খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র সেক্সপীয়র-এর সত্যিকার উত্তরাধিকারী।'

তাঁর অকাল-মৃত্যু তাই কাব্য-প্রেমী মানুষমাত্রকেই চিরদিন দুঃখ দিয়েছে এবং দেবে। আর এই মৃত্যুই বা কী নিষ্করুণ! আজও তাঁর বিস্তৃত জীবন পাঠ করলে অশ্রু রোধ করে রাখা যায় না। অন্তত আমি তো কোনোদিন পারি নি।

১৭৯৫ সালের ৩১শে অক্টোবর ফিন্সবারি পেভমেন্ট-এ বিখ্যাত ইংরেজ কবি জন কীটস-এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মা সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। তাঁর বাবা টমাস কীটস নাকি অশ্বপালন

প্রতিষ্ঠান 'সোয়ান এ্যাণ্ড্ হুপ'-এর প্রধান অশ্বরক্ষক ছিলেন। কীভাবে যেন তিনি পরে তাঁর মনিবের কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং এই বিবাহের পরবৎসরই কবি জন কীটস-এর জন্ম হয়। কীটস-এর দুর্ভাগ্য, শৈশবেই তিনি তাঁর বাবাকে হারান। ১৮০৪ সালে হঠাৎ ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ফলে টমাস কীটস-এর মৃত্যু হয়।

কীটস-এর মায়ের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। তিনি অতিশয় সন্তানবৎসলও ছিলেন। বিশেষত তাঁর বড় ছেলে জন-এর প্রতি তিনি একরূপ স্নেহান্ধ ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। জন-এর সবকিছু খেয়াল-খুশীকেই তিনি প্রশ্রয়ের চোখে দেখতেন। আর জন-এরও খেয়াল-খুশী বা শখের যেন অন্ত ছিল না। ছেলেটা ঠিক অদ্ভুত প্রকৃতির না-হলেও সত্যিই ছিল কিছুটা অন্য ধরনের।

জন-ও তাঁর মাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। অবশ্য মাকে কোন্ ছেলেই বা গভীরভাবে ভালো না বাসে! তবু তার মধ্যেও কিছু বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু এমনই দুঃখের কথা, এই মাকেও তিনি মাত্র পনেরো বছর বয়সের সময় হারালেন। মায়ের টিবি হয়েছিল। অনেকদিন ভুগেছিলেন তিনি। এই সময় কীটস ছুটিতে বাড়ি এলে যথাসাধ্য মায়ের সেবাযত্ন করতেন, তাঁর মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য তাঁকে বই পড়েও শোনাতেন।

বলা বাহুল্য মায়ের মৃত্যু কীটস-এর মনে গভীর আঘাত হানে। দীর্ঘদিন তিনি এই শোকে কাতর ছিলেন। তবে মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা অর্থাৎ তিনি, তাঁর ভাই জর্জ ও টম এবং বোন ফ্যানি একেবারে মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হলেন না। কেননা, তখনো

তাঁদের দিদিমা মিসেস জেনিংস জীবিত। তিনি এবার তাঁদের প্রতি তাঁর মাতৃহৃদয় সম্পূর্ণ মেলে ধরলেন। তিনি ছিলেনও অত্যন্ত উদার ও কোমলহৃদয়া মহিলা। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস, মাত্র তিন-চার বছর পর এই দিদিমারও মৃত্যু হলো। কীটস যেন পুনরায় মাতৃ-হারা হলেন। এ শোকও সে-সময় তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

দিদিমার মৃত্যুর পর কীটস-এর পারিবারিক বন্ধন যেন একরকম ছিন্ন হয়ে গেল। আপন বলতে শুধু রইলো তাঁর ছোট দুই ভাই ও এক বোন। বলা বাহুল্য এই ভাইবোনদের প্রতি তাঁর উষ্ণ হৃদয়ের স্নেহ চিরদিন গভীর ছিল।

লণ্ডন হতে প্রায় মাইল দশেক দূরে এন্‌ফিল্ড-এর একটি স্কুলে কীটস পড়তেন। ছাত্র-জীবনে পড়াশোনায় তিনি নাকি খুবই সাধারণ ছিলেন। স্কুল-জীবনে পড়াশোনার চেয়েও তাঁর খ্যাতি ছিল যে তিনি মারামারিতে ওস্তাদ। অবশ্য, কবি ও কথা-সাহিত্যিকদের জীবনে যেমন সাধারণত দেখা যায়, পাঠ্যের বহির্ভূত বই তিনি প্রচুর পড়তেন। তাঁদের স্কুলের জনৈক অল্পবয়স্ক সহকারী শিক্ষক চার্লস কাউডেন ক্লার্ক তাঁকে এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্যও করতেন। কাউডেন ক্লার্ক কীটস-এর চেয়ে কয়েক বছরের মাত্র বড় ছিলেন। উত্তর জীবনে তিনি কীটস-এর বিশেষ হিতৈষী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন।

১৮১১ সালে কীটস স্কুল ত্যাগ করেন এবং চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঁচ বছরের জন্য টমাস হ্যামণ্ড্ নামে জনৈক সার্জেন ও ঔষধ প্রস্তুতকারকের শিক্ষাধীন হন। খুব সম্ভব তাঁর অভিভাবকের

ইচ্ছাতেই তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে ঝুঁকেছিলেন। যাই হোক, ১৮১৫ সালে হ্যামণ্ড-এর কাছ হতে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ইত্যাদি নিয়ে তিনি আরো শিক্ষার অভিপ্রায়ে আবার 'গাইজ্ হসপিটাল'-এ ভর্তি হন। এখানে প্রায় এক বৎসর শিক্ষান্তে পরীক্ষায় পাস করে তিনি ঔষধ প্রস্তুতকারক হিসাবে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অনুমতি পান। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। সার্জেন বা ঔষধ প্রস্তুতকারক হিসাবে প্র্যাক্‌টিস করতে তিনি আর চাইলেন না। তাঁর অভিভাবক রিচার্ড অ্যাবে-কে স্পষ্ট বললেন যে তিনি সার্জেন হতে চান না। তাঁর কাব্য-রচনার শক্তির উপরই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে ইচ্ছুক। বলা নিষ্প্রয়োজন, এতদিন পর এ-ধরনের অদ্ভুত উক্তি শুনে মিস্টার অ্যাবে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন, ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন. হয়তো উভয়ের মধ্যে কিছু মন কষাকষিও হয়ে থাকবে। কিন্তু কীটস তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

কীটস-এর ছেলেবয়সের শিক্ষক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু চার্লস কাউডেন ক্লার্ক প্রথম হতেই তাঁকে কাব্য-রচনায় নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। এবং এঁরই চেষ্টা ও সাহায্যে কীটস উদারপন্থী এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। সেটা ১৮১৬ সালের কথা। ক্লার্ক কীটস-এর কিছু কবিতা নিয়ে 'একজামিনার' পত্রিকার সম্পাদক লী হান্ট-এর কাছে যান। হান্ট সে-সময়ই একজন বিশিষ্ট কবি ও সুসমালোচক হিসাবে বিশেষ নামী লোক। তাছাড়া অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী বলেও তিনি তখন দেশে যথেষ্ট সুখ্যাত এবং কুখ্যাত। ক্লার্ক ভেবেছিলেন, হান্ট কীটস-এর কবিতাগুলি পড়ে হয়তো মোটামুটি

সন্তোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু ঘটলো সম্পূর্ণ অকল্পিত ব্যাপার। কীটস-এর প্রথম কবিতার লাইন কুড়ি পড়েই হাণ্ট প্রশংসায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এবং কীটস-এর বয়স এত অল্প জেনে সত্যিই ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

হাণ্ট শুধু মুখে প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হলেন না। ১৮১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর পত্রিকা 'একজামিনার'-এ একটি সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে কীটস-কে কাব্যরসিক পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যদিও হাণ্ট কীটস-এর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন তবু অল্প দিনের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। একটিও কবিতার বই প্রকাশের পূর্বেই এই প্রশংসা এবং এই বন্ধুত্ব তরুণ কবির পক্ষে আশ্চর্য সৌভাগ্যের কথা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু, যেমন অনেক সময় হয়, এই সৌভাগ্য আবার কিছুটা দুর্ভাগ্যও টেনে আনলো। নানা কারণে অত্যন্ত উদারনীতিক হাণ্ট-এর প্রতি দেশের রক্ষণশীল টোরি-রা বিশেষ বিরূপ ছিলেন। তাই হাণ্ট-এর এই অতিরিক্ত প্রশংসায় তাঁরা কীটস-এর ওপরও অকারণে বিরূপ হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা কীটস-এর পক্ষে বেশ দুঃখজনক হয়ে ওঠে। কেননা, যেমন সাধারণত হয়, দেশের বহুল প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত সব পত্রিকা ছিল ধনী ও রক্ষণশীলদের হাতে। তাঁরা কীটস-কে স্বীকৃতি তো দিলেনই না বরং আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন এবং অচিরেই সে-সুযোগ পাওয়া গেল।

কীটস-এর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় ১৮১৭ সালে। প্রতিষ্ঠিত বড় পত্রিকায় স্বীকৃতি না-পেলেও কয়েকটি সাধারণ পত্রিকায়

এ বই-এর যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা একেবারে খারাপ নয়। দোষত্রুটির কথা কিছু উল্লেখ করলেও কবি যে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সমালোচনা মোটামুটি ভালো হওয়া সত্ত্বেও বইটি বিক্রি হলো না। কীটস কিছুটা হতাশ হলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দমলেন না। তিনি এর পর অনেক পরিশ্রম করে 'এন্‌ডিমিয়ন' লিখলেন। ১৮১৮ সালে 'এন্‌ডিমিয়ন' প্রকাশিত হলো। এই কাব্যগ্রন্থটির উপর তিনি অনেক আশা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, বইটি যদি ভালোভাবে সমালোচিত হয় এবং ভালো বিক্রি হয় তা হলে সেই অর্থে তিনি সারা ইওরোপ ভ্রমণ করে আসবেন। অবশ্য কবিতার বই-এর ওপর এতটা আশা করা হয়তো অনেকের কাছে নির্বুদ্ধিতা মনে হবে। কিন্তু সেটা ছিল ইংল্যাণ্ডে কবিতা পাঠের যুগ। কবিতার বই তখন বিস্তর বিক্রি হতো। 'ডন জুয়ান'-এর এক এক ক্যাণ্টোর জন্য বায়রন তখন পেতেন এক হাজার পাউণ্ড করে। টম মুর একটি বই-এর জন্য পেয়েছিলেন তিন হাজার পাউণ্ড। সুতরাং 'এন্‌ডিমিয়ন' যদি ভালোভাবে সমালোচিত হতো এবং ভালো বিক্রি হতো তা হলে কীটস-এর আশা হয়তো সফলই হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হলো না। বরং হলো একেবারে তার বিপরীত। রক্ষণশীল টোরি-দের বিখ্যাত পত্রিকা 'কোয়ার্টারলি' ও 'ব্ল্যাকউডস্‌' ম্যাগাজিনে 'এন্‌ডিমিয়ন-এর' অত্যন্ত কুৎসিত সমালোচনা প্রকাশিত হলো। 'ব্ল্যাকউডস্‌' ম্যাগাজিনে জনৈক লক্‌হার্ট সমালোচনার নামে যে-ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন তা অত্যন্ত ইতর ও অভদ্র। বলা নিষ্প্রয়োজন কীটস-এর মত সুপার-সেন্‌সিটিভ কবি এতে সাংঘাতিক আহত হয়েছিলেন। কিন্তু মুখে তিনি

নাকি শুধু বিষণ্ণ কণ্ঠে এই বলেছিলেন যে, 'ওরা আমাকে জানে না।'

তবে মুখে একথা বললেও এই ঘৃণ্য ইতরামিতে মনে মনে তিনি যে খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা বোঝা যায়। অনেকদিন পর একদা দুর্বল মুহূর্তে তা নাকি প্রকাশও পেয়েছিল। কীটস তখন রোগ-শয্যায়। তাঁর বন্ধু উডহাউস লিখেছেন,—সে-সময় একদিন নাকি তিনি তাঁকে হঠাৎ বলে ওঠেন, 'দ্যাখো, আমি যদি মারা যাই, তা হলে লক্‌হার্ট-এর তোমরা একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

অবশ্য এন্‌ডিমিয়ন-এর কিছু ভালো সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সব স্বল্পপ্রচারিত সাধারণ পত্রিকায়। সুতরাং তাতে তেমন কোনোই সুফল পাওয়া যায় নি। তাছাড়া সে-সময় দেশের সাধারণ পাঠকের ওপর 'কোয়ার্টারলি' ও 'ব্ল্যাকউডস্‌' ম্যাগাজিনের প্রভাব বিস্ময়কর। আর সেই জন্যই মনে হয় এ বইটিও অতিশয় সামান্যই বিক্রি হলো। দীর্ঘদিন এন্‌ডিমিয়ন-এর অবশিষ্ট কপি খোলা অবস্থায় প্রকাশকের ঘরে পড়ে থাকে। অবশেষে একজন পুস্তক-বিক্রেতার কাছে প্রায় ওজন দরে (প্রতি কপি এক পেনি—আধ পেনি করে) প্রকাশক তা বেচে দেন। অবশ্য পরবর্তীকালে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। এন্‌ডিমিয়ন-এর একটি প্রেসেণ্টেশন-কপি দুহাজার চারশ পাউণ্ডেও বিক্রি হয়েছে। কী অদ্ভুত এই ভাগ্যের পরিহাস!

কীটস-এর জীবিতকালে আর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা ১৮২০ সালে। সুতরাং তার কথা যথা সময়ে বলা হবে।

কীটস-এর প্রেম বা প্রণয়পাত্রী বলতে এক কথায় বোঝায় ফ্যানি ব্রন্-কে। কিন্তু ফ্যানির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেও কীটস কয়েকটি মেয়েকে কিছু ভালোবেসেছিলেন কিংবা তাঁদের তাঁর ভালো লেগেছিল। হ্যাঁ, এগুলিকে ভালো লাগার পর্যায়ে ফেলাই সঙ্গত। অন্তত ফ্যানির জন্য তাঁর হৃদয়ে যে উদ্দাম প্রেম জাগ্রত হয়েছিল এঁদের কারো বেলাতেই তা হয় নি।

একদিক হতে দেখলে কীটস বেশ সুপুরুষ ছিলেন, আবার আর একদিক হতে দেখলে তিনি তা ছিলেন না। গ্রীক দেবতার মত ছিল তাঁর মাথা। মুখশ্রী সুন্দর ও প্রতিভা-উজ্জ্বল। শরীরও সুগঠিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কিন্তু তিনি ছিলেন মাত্র পাঁচ ফুট দীর্ঘ। দৈর্ঘ্যের এই স্বল্পতা বা খর্বাকৃতি তাঁকে চিরদিন দুঃখ দিয়েছে। জীবনে তিনি বহুবার আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আহা, আমার যদি সুপুরুষের মত দেহ হতো!'

কীটস-এর মনে তাঁর নিজের আকৃতি সম্পর্কে একটা হীনতাভাব এতই দৃঢ় ছিল যে, কেউ আন্তরিকভাবে তাঁর চেহারার প্রশংসা করলেও তিনি তা বিশ্বাস করতেন না,—এমন কি তাতে আঘাত পর্যন্ত পেতেন। আজীবন সৌন্দর্যের উপাসক কীটস-এর নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে এই হীন ধারণা যে তাঁকে চিরদিন কী যন্ত্রণা দিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

ফ্যানির সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কীটস যাঁদের প্রতি কিছুটা অনুরক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন,—মেরি ফ্রগ্‌লে, বেটি, জেন্ রেনল্ডস, জর্জিয়ানা, জেন্ কোক্স্, মিসেস ইজাবেলা জোন্স্ প্রভৃতি।

মেরি ফ্রগ্‌লে হচ্ছেন কীটস-এর বন্ধু রিচার্ড উডহাউস-এর সম্পর্কিত বোন। কেউ কেউ মনে করেন কীটস-এর প্রথম দিকের অনেক

কবিতা এঁর উদ্দেশেই লেখা। ইনি দেখতেও বেশ সুশ্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে কীটস-এর নিজের হাতে লেখা কয়েকটি কবিতাও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। তবে অনেকের ধারণা, তিনি ছিলেন সে-সময় শুধুমাত্র কীটস-এর সাহিত্য-সমালোচক,—মিউজ্ নন।

কীটস-এর একটি চিঠিতে বেটি-র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যে কে ছিলেন তা আজ পর্যন্তও জানা যায় নি। এবং জেন্ রেনল্ডস-এর মনোভাব কীটস-এর প্রতি যেমনই থাক, কীটস-এর তাঁর প্রতি ভালোবাসা সম্পূর্ণ প্লেটনিক ছিল বলেই মনে হয়। আর জর্জিয়ানা হচ্ছেন কীটস-এর ছোটো ভাই-এর স্ত্রী। সুতরাং তাঁর প্রতিও কীটস-এর ভালোবাসা মোটামুটি নিষ্কাম ছিল মনে করাই সঙ্গত। এই সময় অর্থাৎ ১৮১৮ সালে কীটস-এর ছোটো ভাই জর্জ বিয়ে করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকা বাসের উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করেন। জর্জ-এর স্ত্রী জর্জিয়ানা যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা নয়। কিন্তু এই কল্পনাপ্রবণ ষোলো বছরের মেয়েটির অনাবিল চরিত্র ও আনন্দময় স্বভাব কীটস-কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এঁকে দেখেই কীটস-এর সর্বপ্রথম মনে হয় সুখ জিনিসটা একেবারে কল্পনার বস্তু নয় এবং তা বিবাহিত জীবনে লাভ করাও হয়তো সম্ভব। এর ফলে বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মনের বিরূপ ধারণাও অনেকটা দূর হয়ে যায়। এবং দিনে দিনে তিনি নিজেও বিবাহের প্রয়োজন বোধ করতে থাকেন। এই জর্জিয়ানা-র প্রতি তাঁর হৃদয়ে এক অমলিন স্বর্গীয় ভালোবাসা চিরদিন জাগ্রত ছিল। এই মেয়েটিকেই বোধহয় তিনি জীবনে সর্ব-প্রথম গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন, যদিও তা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার মত কামনাযুক্ত ছিল না।

জেন্ কোক্স-এর প্রতি কিন্তু কীটস নরনারীর স্বাভাবিক ভালোবাসাই অনুভব করেছেন। এবং কীটস-এর মতে এই নারীই তাঁকে সর্বপ্রথম সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিল। তবে জর্জিয়ানা-র প্রতি তাঁর মনে যে আধ্যাত্মিক প্রেম জাগ্রত হয়েছিল এ যেন শুধুমাত্র তার অনুপূরক হলো। জেন্-এর সামনে কীটস নাকি শরীর সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ হীনতাভাব তা-ও বোধ করতেন না। আর তার ফলে সাময়িকভাবে তাঁর মানসিক অশান্তিও দূর হয়েছিল। জেন্ তাঁকে সাংঘাতিক আকর্ষণ করতেন। খুব সম্ভব এঁরই সম্পর্কে কীটস একদা তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন,—গত দুদিন একটি নারীর চিন্তা আমাকে একেবারে অভিভূত করে রেখেছে।

মিসেস ইজাবেলা জোন্স্ খুব সম্ভব রেনল্ডস-দের বন্ধু। তিনি বিশেষ সুন্দরী ও শিল্পরুচি-সম্পন্না ছিলেন। তাঁর গৃহের সাহিত্যিক আবহাওয়া ও তাঁর বিদগ্ধ সাহচর্যের জন্য সে-সময় কীটস প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন। কী জানি কেন, ইজাবেলা কীটস-এর সঙ্গে তাঁর এই বন্ধুত্বের কথা তাঁর পরিচিত জনের কাছে গোপন রাখতে চাইতেন। শোনা যায় এঁরই প্রস্তাবে কীটস 'ইভ অফ সেণ্ট অ্যাগ্নিস' লেখেন। তবে এঁর সঙ্গে এই সাময়িক ঘনিষ্ঠতাকে একটু মধুর বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু ভাবা বোধহয় সঙ্গত হবে না।

অবশেষে ফ্যানি ব্রন্-এর কথা। তখন বসন্ত নয়,—শীত। তা-ও ইংল্যাণ্ডের কঠিন শীত। এই সময় ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে কীটস ফ্যানি ব্রন-কে প্রথম দেখলেন। ওয়েন্টওআর্থ প্লেস-এ ডিল্কে-দের গৃহে এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

ফ্যানি ব্রন তখন আঠারো বছরের তরুণী। একমাথা ব্রাউন চুল, নীল চক্ষু, পুরোদস্তুর ফ্যাশনদুরস্ত সুসজ্জিতা ফ্যানি-কে দেখলে সে-সময় সুন্দরীই মনে হতো। অবশ্য প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী তাঁকে ঠিক সুন্দরী বলা চলতো না। তাঁর জীবনী-লেখিকা এই কথাই লিখেছেন এবং তাঁর ছবি দেখে আমাদেরও তাই মনে হয়েছে। তবে সাজ-পোশাকে ও প্রসাধনে তিনি নিজেকে সুশ্রী করে তুলতে জানতেন। বিশেষত পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁর আগ্রহ ছিল চিরদিন অক্লান্ত। তাছাড়া তাঁর চলায় বলায় চেহারায় নাকি প্রচুর আকর্ষণী-শক্তিও ছিল। নিশ্চয়ই ছিল,—তা না হলে কীটস তাঁকে এমন উন্মত্তের মত ভালো-বাসবেন কেন!

কীটস-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই ফ্যানি কীটস সম্পর্কে অনেক কথা মিসেস ডিল্কের কাছে শুনেছিলেন। শুনেছিলেন, তিনি বিশেষ উদার-হৃদয় এবং আলাপচারিতে অত্যুজ্জ্বল। তিনি যে একজন কবি সে-কথা তো শুনেছিলেনই। এখন, এই প্রথম সাক্ষাতেই এসব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন। বিশেষত কীটস-এর গ্রীসীয় মুখ, স্বপ্নময় উৎসুক দৃষ্টি, এলোমেলো পোশাক প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে হলো কবি সম্পর্কে তাঁর মনে যে-ধারণা এতদিন ছিল তার সঙ্গে কীটস-এর সবকিছুই যেন চমৎকার মিলে গেছে। সুতরাং কীটস যে সত্যিকার কবি সে-বিষয়ে তাঁর কোনোই সংশয় রইলো না।

অনেকেই হয়তো জানেন, সাধারণত কবিতার প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ তেমন না-থাকলেও, কী জানি কেন, কবির প্রতি তাঁরা বেশ কিছুটা আকৃষ্ট হন। ফ্যানিও হলেন। সুতরাং এর পরও তাঁদের নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ চলতে লাগলো। তবে প্রথম-প্রথম ফ্যানি

যথারীতি মেয়েলী স্বভাববশত ভান করতেন যেন কীটস-কে তাঁর একেবারেই ভালো লাগে না। অথচ প্রকৃতপক্ষে কীটস-এর ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার, শিক্ষিত সাহিত্যালাপ, বুদ্ধিদীপ্ত রঙ্গ-রসিকতা সবই তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগতো।

এই পরিচয়ের কিছুকাল পূর্বে কীটস-এর কনিষ্ঠ ভাই টম ক্ষয়-রোগাক্রান্ত হয়েছিল। সেজন্য কীটস-এর মনের গভীরে সব সময়ই একটা উদ্বেগ ও অশান্তি জমা থাকতো। ফ্যানি-র বাবাও ক্ষয়রোগে মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর ছোট ভাই-এর স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই তিনি তাই কীটস-কে আন্তরিক সহানুভূতি জানাতেন। এই সহানুভূতি কীটস-এর অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করতো। তাছাড়া ফ্যানি-র মা মিসেস ব্রন কীটস-কে তাঁদের এল্‌ম-কটেজ-এ প্রায়ই আমন্ত্রণ করতেন এবং কীটস-এর মা নেই জেনে কীটস-এর সঙ্গে প্রায় মায়ের মত সস্নেহ ব্যবহার করতেন। মা ও দিদিমার মৃত্যুর পর হতে কীটস-এর মনের অতলে এই স্নেহলাভের আকাঙ্ক্ষাও বোধহয় সুপ্ত ছিল। যাই হোক, ফ্যানি এবং তাঁর মা উভয়কেই তাঁর বিশেষ ভালো লেগে গেল।

সে-সময়ে অর্থাৎ সেই নভেম্বরে যদিও কীটস ভাই-এর অসুখের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং 'হাইপেরাইওন' রচনায় ব্যস্ত তবু মনে হয় অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি ফ্যানি-কে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন। ক্রীসমাসের দিন মিসেস ব্রন আবার তাঁকে এল্‌ম-কটেজ-এ আমন্ত্রণ জানালেন। কীটস এলেন এবং সেইদিনই, সেই ১৮১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শুক্রবারে তিনি ফ্যানি-র কাছে তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। ফ্যানি নাকি সানন্দেই সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

এই দিনটি সম্পর্কে তিনি পরে নাকি লিখেছেন,—তখন পর্যন্ত সেই দিনটি ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখের।

কিন্তু মিসেস ব্রন তখনই বিবাহে সম্মত হলেন না। যতদিন না কীটস-এর ভবিষ্যতের কিছু আশা দেখা যাচ্ছে ততদিন তিনি বিবাহ স্থগিত রাখতে চাইলেন। আর বাস্তবিক পক্ষে কীটস-এর ভবিষ্যৎ তখন সত্যিই অন্ধকার। অন্তত অনিশ্চিত তো বটেই। কবিতার জন্য অনেকদিন পূর্বেই তিনি মেডিক্যাল লাইন ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ তাঁর এন্‌ডিমিয়ন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় সাংঘাতিকভাবে সমালোচিত হয়েছে। তাঁর বই দোকানে পড়ে থাকে। এমন কি নিজের আয়ে তাঁর জীবিকানির্বাহও হয় না। তাছাড়া তাঁর পরিবারে ক্ষয়রোগের ইতিহাস আছে। এবং তিনি নিজেও প্রায়ই ভালো থাকেন না— গলার ক্ষতের জন্য ভোগেন। সুতরাং বিবাহ অনির্দিষ্ট কালের জন্যই স্থগিত রইলো। বলা বাহুল্য কীটস খুব নিরাশ হলেন। তবে তার ফলে তাঁর প্রেমাবেগ কিছুমাত্র হ্রাস পেলো না। বরং তা দিনে দিনে আরো উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগলো।

কীটস তখন ওয়েন্টওআর্থ প্লেস-এ বন্ধু ব্রাউন-এর কাছে থাকতেন। জানুয়ারীর শেষের দিকে তিনি ওয়েন্টওআর্থ প্লেস ত্যাগ করে গেলেন। কিন্তু শরীরিক অসুস্থতার জন্য ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকেই আবার সেখানে ফিরে এলেন। শারীরিক কারণে তিনি তখন সারাক্ষণ গৃহে আবদ্ধ থাকতেন। ফ্যানি প্রায়ই আসতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু কীটস তখন থেকেই ঈর্ষা ও সন্দেহে ভুগতে শুরু করেছেন। নিজের দৈহিক সৌন্দর্য বা আকর্ষণীয়তা সম্পর্কে তাঁর মনে বরাবরই

একটা হীনতাভাব ছিল। অসুস্থতায় সেটা আরো বেড়েছিল। সেজন্য তাঁর প্রায়ই সন্দেহ হতো ফ্যানি বোধহয় অন্য কাউকে ভালো-বাসছেন। অবশ্য এ ধরনের চিন্তা বা সন্দেহের কতকগুলি সঙ্গত কারণও ছিল। তাঁদের বাগ্‌দানের কথা যতদূর সম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল। এবং মিসেস ব্রন তখনও অনেক তরুণকে গৃহে আমন্ত্রণ করছিলেন এবং স্থানীয় সোসাইটিতে তাঁর কন্যার আমন্ত্রণ গ্রহণেও বিরত হচ্ছিলেন না। কী তাঁর মনে ছিল কে জানে। কীটস-এর চেয়ে আরো ভালো পাত্র লাভের তিনি আশা করেছিলেন কি না তা-ও অজানা। তাছাড়া ফ্যানিও কিছুটা লঘু ও চটুল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। কীটস ও তাঁর প্রেমের অসামান্যতা সম্যক উপলব্ধি করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল মনে হয়। কীটস নাচতে পারতেন না। তাঁর মত মানুষের পক্ষে তা না-পারা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে-সময় তিনি নিজে ফ্যানি-কে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতেও পারতেন না। এজন্য ফ্যানি প্রায়ই আর্মি-অফিসারদের সঙ্গে বিভিন্ন পার্টিতে যেতেন। তাছাড়া থিয়েটার, নাচের আসর ইত্যাদিতে গিয়ে আমোদ উপভোগ তো করতেনই।

ভাবী স্বামী যখন অসুস্থতার জন্য গৃহে বন্দী সে-সময় এভাবে সেজে-গুজে প্রজাপতির মত নেচে বেড়ানো যে ভালো নয় সে-কথা পুরুষমাত্রই বোধহয় বলবেন। কিন্তু অধিকাংশ স্বাধীন মেয়ের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক কিনা তা একমাত্র মেয়েরাই বলতে পারেন। যাই হোক, এইসব নানা কারণের জন্য কীটস তখন থেকেই ভয়, ঈর্ষা ও সন্দেহের জ্বালায় জ্বলতে শুরু করেছেন। তাঁর এই সময়কার একটি কবিতাতেও তার আভাস পাওয়া যায়।

"Ah ! dearest love, sweet home of all my fears
And hopes, and joys, and panting miseries,—
To-night, if I may guess, thy beauty wears
A smile of such delight,
As brilliant and as bright,
As when with ravished, aching, vassal eyes,
Lost in soft amaze,
I gaze, I gaze !

Who now, with greedy looks, eats up my feast ?
What stare outfaces now my silver moon !
Ah ! keep that hand unravished at the least ;
Let, let the amorous burn—
But, pr'y thee, do not turn
The current of your heart from me so soon.
O ! save, in charity,
The quickest pulse for me.

* * * * * * * * * *

Ah ! if you prize my subdued soul above
The poor, the fading, brief pride of an hour ;
Let none profane my holy sea of love
Or with a rude hand break
The sacramental cake :
Let none else touch the just new-budded flower ;
If not—may my eyes close,
Love ! on their last repose."

এই সন্দেহ, ভয়, ঈর্ষা ইত্যাদির জন্য দুজনের মধ্যে কিছু মন কষাকষিও চলছিল। মন কষাকষির আরো কিছু কারণ ছিল। ফ্যানি নিজেও নাকি সে-সময় বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি নাকি বলেছিলেন কয়েক বছর অপেক্ষা করাই ভালো। অর্থাৎ শুধু মা নয়, তিনিও তখন পর্যন্ত কীটস-কে বিবাহের উপযুক্ত মনে করছিলেন না। ইতিমধ্যে ফ্যানিরা কীটস-এর পাশের বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। কীটস লক্ষ্য করতেন যে-সব বিদেশী ভদ্রলোক বাড়িতে আসেন ফ্যানি তাঁদের সঙ্গে শুধুমাত্র ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলেন। কীটস নিষেধ করা সত্ত্বেও নাকি ফ্যানি তা শুনতেন না। কীটস-এর ফরাসী মোটামুটি জানা থাকলেও কথ্য ভাষার ওপর একেবারে দখল ছিল না। সেজন্য ফ্যানির ওপর তিনি খুবই বিরক্ত হতেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন ফ্যানি তাঁদের সঙ্গে বড় বেশী মাখামাখি ও নাচানাচি করেন। তিনি সেটা আদৌ পছন্দ করতেন না। কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা।

অথচ তখন আর মন ফেরাবার উপায় নেই। প্রেম প্রত্যাহার করা অসম্ভব। সুতরাং কীটস যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন। কী করবেন তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। বাস্তব জীবনের অসাফল্যই এ-সবের মূল কারণ বলে হয়তো তিনি মনে করছিলেন। নানারূপ আঘাতের ফলে সময়-সময় তাঁর এমনও মনে হচ্ছিল যে কাব্যক্ষেত্রে সত্যিই হয়তো তাঁর কোনো আশা নেই! সুতরাং অন্য কোনো বৃত্তি গ্রহণ করবেন। তাছাড়া কবিতাতেও মন বসাতে পারছিলেন না। ফ্যানি পাশের বাড়িতে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, বাগানে বা পথে হঠাৎ তাঁকে দেখা যায়,—আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন তাঁর দিকে চলে যায়।

এসব সত্ত্বেও একদিন মে মাসের উজ্জ্বল প্রভাতে মালবেরি গাছের নীচে বসে তিনি লিখলেন, 'ওড টু এ নাইটিংগেল' এবং এই মাসেই রচনা করলেন, 'ওড অন এ গ্রীসীয়ান আর্ন'। ছ সপ্তাহ চমৎকার কবিতা লেখা চললো।

তবু কীটস স্থির করতে পারছেন না একজন সার্জেন হবেন, না শুধুমাত্র কবিই থেকে যাবেন। সারাটা জুন মাস মনের এই দোটানা ভাব চললো। বন্ধু ব্রাউন তাঁকে কবিতা রচনায় উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রয়োজন মিটাবার জন্য আর্থিক সাহায্যও করলেন। অবশেষে কিছুটা আশা, কিছুটা নৈরাশ্যের মধ্যে একদিন তিনি জানালেন, 'বেশ, আমি আর একবার লেখার চেষ্টা করে দেখবো। তাতেও যদি ব্যর্থ হই, তা হলে আমার নাম আর তোমরা কখনো শুনতে পাবে না।'

জুন মাসের একেবারে শেষের দিকে কীটস ওয়েন্টওআর্থ প্লেস ত্যাগ করলেন। যাওয়ার পূর্বে ফ্যানি-কে বলে গেলেন ভাগ্যের পরিবর্তন না করে তিনি আর ফিরবেন না। বললেন, সত্যিই তাঁর বর্তমান অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে ফ্যানি-কে জড়িয়ে ফেলতে চাওয়াটা স্বার্থপরের কাজ।

দূর হতে কীটস চিঠি লিখতে লাগলেন। নিয়মিত পত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগলো। এই সব চিঠিতেও তিনি অবিরত ফ্যানির প্রেম হারাবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন, আমাকে নিছক ভাগ্য ও আশার ওপর নির্ভর করেই থাকতে হবে। যদি অবাঞ্ছিত কিছু

ঘটেই তা হলেও অবশ্য আমি তোমাকে ভালোবাসবো, চিরদিন তোমাকেই ভালোবাসবো।

শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাফল্য, প্রেম-জীবনে অনিশ্চয়তা এবং আরো নানা কারণে এই সময় থেকেই বোধহয় কীটস-এর মনে মৃত্যু-চিন্তা প্রবল হয়ে উঠছিল। তিনি ফ্যানি-কে লিখেছেন,—'যখন আমি একা পথ হাঁটি সে-সময় তোমার কমনীয় লাবণ্য ও আমার মৃত্যুর ক্ষণ—এই দুটি বিষয়ের ধ্যানই যেন আমার এক বিলাস হয়ে উঠেছে। আহা, আমি যদি এই দুটি জিনিসকেই একসঙ্গে পেতাম! আমি এই পৃথিবীকে ঘৃণা করি। এই পৃথিবী আমার আত্ম-ইচ্ছার পাখায় বড় বেশী আঘাত দেয়। আহা, তোমার ঠোঁট থেকে একটু মধুর বিষ গ্রহণ করে আমি যদি এর বাইরে চলে যেতে পারতাম!'

বিভিন্ন চিঠিতে এমনি আরো অনেক কথা।

অক্টোবর মাসে কীটস আবার ওয়েন্টওআর্থ প্লেস-এ ফিরে এলেন। দেখা গেল এই অল্প দিনের মধ্যে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি নিজেও যথেষ্ট পরিবর্তন অনুভব করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি নাটক লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করে ছেড়ে দিলেন। আসলে তখন তাঁর মন দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। তাঁর ভাই জর্জ সে সময় দারুণ আর্থিক সংকটে পড়েছেন। জর্জই এখন তাঁর একমাত্র ভাই। কেননা, ইতিমধ্যে টম ক্ষয়রোগে মারা গিয়েছে। কীটস-এর নিজের শরীরও তেমন ভালো নয়। ডিসেম্বরের শীতে তাঁর শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল এবং আবার তিনি গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। অথচ ফ্যানি যথারীতি সাজগোজ করে বিভিন্ন পার্টিতে যাচ্ছেন। কীটস-

এর সঙ্গে যাওয়ার উপায় নেই। এবং তিনি ফ্যানি-কে এভাবে যাওয়ায় নিবৃত্ত করতেও পাচ্ছেন না। সুতরাং তিনি গৃহে বন্দী থেকে শুধু ভয় করেন, সন্দেহ করেন আর ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে থাকেন।

তাঁর একমাত্র ভাই দারুণ অর্থনৈতিক সংকটে তলিয়ে যেতে বসেছে, মহৎ কবিতার প্রেরণা মনে হয় সাময়িকভাবে তাঁকে ত্যাগ করেছে, এর উপর নিজের শরীর অসুস্থ, একমাত্র সান্ত্বনা যে প্রেম তা-ও সময় সময় মরীচিকা বলে মনে হচ্ছে। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। জীবনে তখন যেন তাঁর শুধু যন্ত্রণা—শুধুই যন্ত্রণা। এর মধ্যে প্রেমের যন্ত্রণাই বোধহয় সর্বাধিক। তাঁর কবিতাতেও সে-যন্ত্রণা স্পষ্ট ধ্বনিত,—স্পন্দিত—

"I cry your mercy—pity—love! aye, love!
Merciful love that tantalises not,
One-thoughted, never-wandering guileless love,
Unmask'd, and being seen—without a blot!"

ধীরে ধীরে শীত শেষ হচ্ছে। কীটস-এর শরীর মন কোনোটাই ভালো নয়। তবু ওরই মধ্যে শরীর যেন একটু ভালো বোধ হচ্ছে। ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখে কী জানি কেন তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন। ফিরলেন প্রায় রাত্রি গোটা এগারোর সময়। বন্ধু ব্রাউন তাঁর চেহারা দেখে ভয় পেলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার। তোমার জ্বর হয়েছে নাকি?'

'—হ্যাঁ হ্যাঁ।'—বলতে বলতে কীটস পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরে কীটস-এর কাশির শব্দ শোনা গেল আর তারপরই তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর: 'ব্রাউন, আলো নিয়ে এসো। আমার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে। আমি রক্তটা দেখতে চাই।'

আলো ফেলে কীটস খুব ভালোভাবে রক্তটা দেখলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, 'এই রক্তের রঙ আমি চিনি। এ রক্ত আর্টারি থেকে এসেছে। এ-ই আমার মৃত্যুর পরোয়ানা। আমাকে মরতে হবেই।'

ব্রাউন লিখেছেন, সে-সময় কীটস-এর মুখের প্রশান্তি ভয়ঙ্কর এবং কোনো দিন তা ভুলবার নয়।

এরপর কীটস সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাঁর একমাত্র চিন্তা ফ্যানি। কদিন পরই তিনি ফ্যানি-কে লিখেছেন, যেদিন রাত্রে আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি, যখন আমার মুখ দিয়ে এত রক্ত উঠছে যে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা, আর মনে হচ্ছে হয়তো আমি বাঁচবো না—সেই ভীষণ মুহূর্তেও আমার শুধু তোমার কথাই মনে হয়েছে, তোমার কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, এরপর ফ্যানি কীটস-কে প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর অসুখ যতদিন না ভালো হয়, তা সে যতদিন হোক, তিনি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন।

কয়েকদিন পর লণ্ডন হতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর ব্রী এলেন কীটস-কে দেখতে। তিনি কিন্তু কীটস-এর অসুখের ওপর বিশেষ কোনোই গুরুত্ব আরোপ করলেন না। রক্ত ওঠার ইতিহাস থাকা

সত্ত্বেও কীটস-কে পরীক্ষা করে ডক্টর ব্রী ব্রাউন-কে আশ্বাস দিয়ে গেলেন 'যে তাঁর ফুসফুসে কিছুই হয় নি, দৈহিক কোনো বৈকল্যও নয়, কীটস-এর যা অসুখ তা হচ্ছে শুধু মনে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ডাক্তার ভুল করলেন—ভীষণ ভুল করলেন। কিন্তু ডাক্তারের ভুল সংশোধন করবে কে ?

যাই হোক, চিকিৎসায় ভুল হলেও কীটস-এর সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি হলো না। বন্ধু ব্রাউন তাঁকে দিবারাত্র দেখাশোনা করতে লাগলেন।

পাশের বাড়িতে থাকার জন্যই বোধহয় এ সময় ফ্যানি প্রায়ই আসতেন কীটস-কে দেখতে। কিন্তু ফ্যানি-কে দেখামাত্র কীটস-এর স্নায়ু এত উত্তেজিত হয়ে উঠতো যে তাঁর শরীরের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় বন্ধু ব্রাউন ফ্যান্নির আগমন তেমন পছন্দ করতেন না। কীটস তাই ফ্যানি-কে লিখেছিলেন, যে-সময় ব্রাউন না-থাকে সেই সময় যেন ফ্যানি আসেন এবং অনেকক্ষণ থাকেন।

ক্রমে কীটস-এর শরীর কিছুটা সুস্থ হলে ডাক্তার তাঁকে পায়ে হেঁটে পর্যটন বা দেশ-ভ্রমণের উপদেশ দিলেন। ডাক্তার আবার ভুল করলেন। যাই হোক, কীটস এতে রাজী হলেন না। তিনি জানতেন পায়ে হেঁটে পর্যটন করা কী রকম কষ্টকর এবং কতটা শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয় তাতে। কিন্তু গ্রীষ্মে ব্রাউন ওয়েন্টওআর্থ প্লেস ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় তাঁকে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই হলো। তিনি স্থির করলেন শরীর আরো কিছুটা সুস্থ হলে কেন্টিশ্ টাউন-এ গিয়ে থাকবেন। লেখার আকাঙ্ক্ষা তখন

তিনি একরকম বিসর্জন দিয়েছেন। ভাবছেন, যদি বাঁচেন তা হলে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাবেন, নয়তো 'ইণ্ডিয়াম্যান'-দের সার্জেন হবেন। শেষেরটাই হয়তো তাঁর কপালে আছে তিনি মনে করছিলেন।

মে মাসের প্রথম দিকে তিনি কেন্টিশ্ টাউন-এ এসে উপস্থিত হলেন। মর্টিমার টেরাস-এ হাণ্ট-এর বাড়ির কাছে তিনি বাসা নিলেন। হাণ্ট-এর সাহচর্য তাঁর পক্ষে বিশেষ আনন্দের ছিল।

ধীরে ধীরে তিনি এখানে আরো সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ফ্যানির চিন্তা তিনি একদিনের জন্যও মন থেকে সরাতে পারলেন না। দেখা যায় পাশের বাড়িতে যখন ছিলেন তখন যেমন এখনও তেমনি নিয়মিত তাঁদের পত্রালাপ চলেছে। আবেগ-স্পন্দিত সেই সব চিঠি পড়লে কীটস-এর প্রেমের তীব্রতা অনুভব করা যায়। কখনো তিনি ফ্যানি-কে শুধুই তাঁর অনাবিল ভালোবাসা জানিয়েছেন, তাঁর একান্ত মঙ্গল কামনা করেছেন, কখনো ফ্যানির বিশ্বস্ততায় স্পষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকটা এই ধরনের কথা লিখেছেন,—হয়তো ইতিমধ্যে তোমার মনের পরিবর্তন হয়েছে, হয়তো হয় নি। যাই হোক, তুমি যদি নাচঘরে বা অন্য সোসাইটিতে আমি তোমাকে যে-রকম ভাবসাব করতে দেখেছি এখনো সেইরকম চালিয়ে যেতে থাকো তা হলে আমি আর বাঁচতে চাই না। মৃত্যুই আমার শ্রেয়। আগামী রাত্রিই আমার শেষরাত্রি হোক। আবার কখনো এই ধরনের কথা লেখার জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। লিখেছেন,—সত্যিই আমি দুঃখিত। তোমাকে যে দুঃখ দিয়েছি সেজন্য আমি সত্যিই ভীষণ দুঃখিত।

এমনি তিক্ত, মধুর, কঠোর, স্নিগ্ধ পত্রের আদান-প্রদান নিয়মিত চলেছে।

১৮২০ সালের পয়লা জুলাই কীটস-এর 'লামিয়া, ইজাবেলা, দি ইভ অফ সেন্ট অ্যাগ্‌নিস্‌ অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস্‌' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাদিতে এ বইটির সমালোচনা বেশ ভালোই হয়েছিল। টোরি-দের যে-সব পত্রিকা প্রশংসা করতে পারেন নি তাঁরা অন্তত নীরব ছিলেন। পুনরায় আর তাঁকে আক্রমণ করেন নি। কিন্তু কীটস-এর দুর্ভাগ্য, সমালোচনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে এ বইটিও ভালো বিক্রি হয় নি। বই বিক্রির ব্যাপারে বারবার এই ব্যর্থতায় কীটস খুবই নিরাশ হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে কীটস-এর কাশির সঙ্গে আবার রক্ত উঠেছিল। এ সময়ও অবশ্য ডাক্তার যথারীতি বলেছিলেন যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাণ্ট কীটস-এর পৃথক বাড়িতে থাকা সমীচীন মনে করেন নি। তিনি কীটস-কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। হাণ্ট নিজেও তখন কিছুটা অসুস্থ এবং তাঁর আর্থিক অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়। তবু মহৎ-হৃদয় হাণ্টদম্পতি কীটস-এর জন্য যথাসাধ্য করতে লাগলেন। কিন্তু উপযুক্ত সেবাযত্ন সত্ত্বেও ফ্যানির চিন্তা এবং আরো নানা কারণে তাঁর মনে যে হতাশা ও নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত ছিল তার জন্যই বোধহয় তাঁর স্বাস্থ্যের তেমন কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। তিনি সত্যিই তখন দুঃখে ও হতাশায় যেন ভেঙে পড়েছিলেন। একদিন হাণ্ট-এর সঙ্গে বেড়াতে বার হয়ে তাঁরা ওয়েণ্টওআর্থ প্লেস-এর নিকটে এক জায়গায় এসে বসেন। হাণ্ট লিখেছেন, কথাবার্তা বলতে অকস্মাৎ

এক সময় কীটস জলভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন যে তাঁর হৃদয় একেবারে ভেঙে গেছে আর সেই জন্যই তিনি মরতে চলেছেন।

এ সময় কীটস খুব রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে যারা ভালোবাসতেন তাঁরা তাঁর চেহারা দেখে দুঃখ পেতেন, ভয় পেতেন। কোনোভাবেই তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হচ্ছে না দেখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আবার ওয়েন্টওআর্থ প্লেস-এ নিয়ে আসা হলো। কিন্তু তবু স্বাস্থ্যের খুব একটা উন্নতি দেখা গেল না। এর উপর ডাক্তার বললেন, শীত আসছে এবং ইংল্যাণ্ডের এই দারুণ শীত কীটস-এর রুগ্ন শরীর কিছুতে সহ্য করতে পারবে না। সুতরাং শীতের সময় তার ইতালীতে গিয়ে বাস করাই সমুচিত। সেখানে ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ক্লার্ক আছেন। তার ফলে চিকিৎসারও কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু অত দূর দেশে যাওয়ার চিন্তাতে কীটস ভয় পেয়ে গেলেন। বিশেষত এই দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার চিন্তা তাঁর মনকে বিশেষ পীড়িত করতে থাকলো। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'আমি যাওয়ার চেষ্টা করবো। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে এগিয়ে যেতে বাধ্য হতে হলে যেমন লাগে, আমারও সেই রকম লাগছে।'

যাই হোক, দিনে দিনে শীত এগিয়ে এলো। ইতিমধ্যেই গাছপালার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পাখিরা গরম দেশের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। সকাল এবং সন্ধ্যা শীতলতর বোধ হচ্ছে। তবু কীটস যাওয়ায় কয়েকদিন দেরি করলেন। হান্ট তা সস্নেহে অনুমোদনও করলেন। আসলে শুধু সমুদ্র-যাত্রার ভয় নয়, ফ্যানি-কে ছেড়ে অত দূর দেশে যেতেই তাঁর একেবারে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যাত্রার নির্ধারিত দিনও এসে গেল। ১৩ই সেপ্টেম্বর কীটস ফ্যানির কাছ হতে বিদায় নিলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি কয়েকটি বই, আরো টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র এবং তাঁর নিজের একটি ছবি ফ্যানি-কে দিয়ে গেলেন। ফ্যানি পরিবর্তে তাঁকে দিলেন একটি পকেট বই, একটা কাগজ-কাটা ছুরি, আলোর কিছু জিনিস এবং একটি সাদা ডিম্বাকৃতি কোর্নেলিয়ান, যা কবচের মত সমস্ত বিপদ-আপদ হতে তাঁকে রক্ষা করবে বলে ফ্যানির বিশ্বাস। কীটস ফ্যানির একগোছা চুল কেটে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

কীটস-এর সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার শিল্পীবন্ধু সেভার্ন চললেন ইতালীতে। কীটস-এর সঙ্গে যাওয়ায় সেভার্ন-এর পারিবারিক অনেক বাধা ছিল। কিন্তু সে-সব তিনি গ্রাহ্যও করলেন না। তাঁর অসুস্থ বন্ধুর তাঁকে প্রয়োজন, এর চেয়ে বড় তাঁর কাছে আর কিছু ছিল না। সেভার্ন-এর বন্ধুত্বের বোধহয় তুলনা হয় না। মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত তিনি যে-ভাবে প্রাণ দিয়ে কীটস-এর সেবা করেছেন তা-ও অতুলনীয়। আমাদের দেশে একমাত্র পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে হয়তো তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও সব বাধা অতিক্রম করে তাঁর ক্ষয়রোগাক্রান্ত সাহিত্যিক বন্ধু গোকুল নাগের সঙ্গে গিয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হৃদয় ও ব্যক্তিত্বও আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে অসাধারণ।

অক্টোবরের শেষে কীটস ও সেভার্ন ইতালীতে পৌঁছলেন। কীটস-এর মনে একেবারে শান্তি নেই। কী করেই বা থাকবে? যে কবিতা তাঁর প্রাণ, সেই কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনে তখন গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া ফ্যানি-কে তিনি উন্মাদের মত

ভালোবেসেছিলেন। অথচ ফ্যানি-কে পাওয়ার আর আশা নেই। তিনি মনে মনে একরকম বুঝেছিলেন যে তিনি আর ফিরে যেতে পারবেন না। ফ্যানি-কে হারাবার ভয় ও বেদনাই তাঁর তখন সবচেয়ে যন্ত্রণাকর হয়ে উঠেছিল। কদিন পর নেপল্‌স্ থেকে তিনি বন্ধু ব্রাউন-কে স্পষ্ট লিখেছেন, 'মৃত্যুর চিন্তা আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু ওকে (ফ্যানি-কে) ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা আমার কাছে অসহ্য।······ওর সম্পর্কে আমার কল্পনা এমন সাংঘাতিকভাবে জীবন্ত যে আমি যেন ওকে স্পষ্ট দেখতে পাই, ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।···ওকে আমার চিঠি লিখতেও ভয় হয়, ওর চিঠি পেতেও আমার ভয়, ওর হাতের লেখা দেখলেও হয়তো আমার বুকে ভেঙে যাবে।······যদি আমার ভালো হওয়ার কোনো আশা থাকতো তা হলেও এই দারুণ প্রেমই আমায় মেরে ফেলতো।' অতঃপর কীটস লিখেছেন ব্রাউন যখন তাঁকে চিঠি লিখবেন তখন ফ্যানি যদি ভালো থাকে তা হলে তিনি যেন চিঠিতে শুধুমাত্র একটা প্লাস চিহ্ন দেন। আর কিছু না। কেননা, ফ্যানির নাম লেখা দেখলেও হয়তো তিনি অশান্ত হয়ে উঠবেন। শেষের দিকে কীটস আবার আবেগময় ভাষায় লিখেছেন—'ও ব্রাউন, আমার বুকের মধ্যে কয়লার আগুন জ্বলছে। আমি ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, মানুষের হৃদয় এত দুঃখ ধারণ ও বহন করতে পারে! আমি কি এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যই জন্মেছিলাম?' পরিশেষে তিনি ফ্যানি, ফ্যানির মা, তাঁর বোন, তাঁর ভাই, ভাই-এর স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব সকলের জন্যই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

কয়েকদিন পর কীটস ও সেভার্ন রোমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রোমের ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ক্লার্ক কীটস-এর চিকিৎসার ভার

গ্রহণ করলেন। ডক্টর ক্লার্ক মানুষ হিসাবে নাকি বেশ ভালোই ছিলেন। তবে তাঁর চিকিৎসা যে একেবারে ভালো ছিল না সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এর কুচিকিৎসাই কীটস-এর মৃত্যু এত ত্বরান্বিত করেছিল। কীটস-এর শরীর একটু ভালো হতেই তিনি তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার নির্দেশ দিলেন। ফল যা হলো তা বলাই বাহুল্য। কয়েকদিনের মধ্যেই কীটস-এর ভীষণ রক্ত উঠলো। এর উপর আবার ডক্টর ক্লার্ক কীটস-এর হাত থেকে আট আউন্স রক্ত বার করে নিলেন। এই রকম তিনি বারবার কীটস-এর শরীর থেকে রক্ত বার করে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা, রক্ত বেশী হওয়ার জন্যই এই রক্ত উঠছে। তিনি কীটস-কে খেতেও দিতেন এত অল্প যে তাতে একটা ইঁদুর বাঁচে কিনা সন্দেহ। ক্ষুব্ধ হয়ে মাঝে মাঝে নাকি কীটস বলতেন যে তিনি খিদের জ্বালাতেই মারা যাবেন। শরীরে ও মনে তাঁর যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সেভার্ন-এর জন্য শেষ পর্যন্ত তা আর সফল হয় নি। তিনি কীটস-এর মনের ভাব বুঝতে পারামাত্র ঘরে যে এক বোতল আফিমের আরক ছিল তা সরিয়ে ফেলেন। তার ফলে কীটস তাঁর ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। পরে রাগ কিছু কমলে তিনি বোতলটি দেওয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করেন। কিন্তু সেভার্ন অটল। ফলে কীটস রাগে ও হতাশায় এমন হয়ে ওঠেন যে সেভার্ন-এর ভয় হয় যে এই প্রচণ্ড আবেগই হয়তো তাঁর মৃত্যু ঘটাবে।

কীটস-এর যন্ত্রণা দেখে সময়-সময় সেভার্ন চোখের জল রাখতে পারতেন না। কিন্তু কী করবেন তিনি? প্রাণ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করা ছাড়া আর কী করতে পারেন তিনি।

যাই হোক, কীটস-এর শরীর দু-একবার একটু ভালোর দিকে গিয়ে জানুয়ারীর শেষে আবার খুব খারাপ হয়ে পড়ল। এবার সাংঘাতিক রক্ত উঠেছিল তাঁর। তিনি বুঝলেন এই শেষ আক্রমণ। তবে মৃত্যুর দিন যত এগিয়ে আসতে লাগলো তিনি তত শান্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষের দিকে তিনি নিজের চেয়েও সেভার্ন-এর জন্যই বোধহয় বেশী চিন্তা করতেন। বেচারি সেভার্ন, সর্বদাই তাঁর শয্যাপার্শ্বে। একটু বেড়াতে যেতেও পারেন না।

দিনে দিনে অত্যন্ত ধীর মন্থর পদে মৃত্যু এগিয়ে আসতে লাগলো। অবশেষে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বিকেল সাড়ে চারটের সময় কীটস হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'সেভার্ন, আমাকে একটু তুলে ধরো; আমি মারা যাচ্ছি,··· আমি সহজেই মরবো।' তারপর বন্ধুর ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'ভয় পেয়ো না। ভগবানকে ধন্যবাদ,···অবশেষে মৃত্যু এলো।'

সেভার্ন তাড়াতাড়ি এসে কীটস-কে ধরলেন। বুকের মধ্যে তখন ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তবু জীবন আরো সাত ঘণ্টা যুদ্ধ চালালো। গোটা এগারোর সময় শ্বাসপ্রশ্বাস আবার বেশ সহজ হয়ে এলো। তার অল্পক্ষণ পর মধ্য রাত্রের পূর্বেই সেভার্ন-এর হাতের মধ্যেই হতভাগ্য কবি জন কীটস-এর সব যন্ত্রণার শেষ হয়ে গেল। মনে হলো তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দুদিন পর অর্থাৎ ১৮২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তাঁকে কবরস্থ করা হলো। কফিনের মধ্যে ফ্যানির উপহার-দেওয়া সব জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্যানির যে-চিঠি তিনি জীবিতাবস্থায় ভয়ে খুলে

দেখতেও পারেন নি সেই চিঠিটিও তাঁর বুকের ওপর রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে কি তাঁর তখন কোনো শান্তি ছিল? কে জানে!

অতঃপর আর একটি কথা। কীটস যে ফ্যানি-কে উন্মত্তের মত ভালোবেসেছিলেন সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাঁর প্রেম তাঁর ভয়, সন্দেহ, যন্ত্রণা সবই আশ্চর্য। কিন্তু কথা হচ্ছে, ফ্যানি ব্রন্ কি কীটস-কে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন? যদি বেসে থাকেন তা হলে সে ভালোবাসাই বা কেমন?

ফ্যানি সম্পর্কে বহু বিরুদ্ধ কথা শুনতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, ফ্যানি কীটস-কে সত্যি-সত্যি ভালোবাসেন নি। প্রণয় নিয়ে কিঞ্চিৎ খেলা করেছিলেন মাত্র। ফ্যানির মত একটি লঘুচিত্ত মেয়েকে ওরকম উন্মাদের মত ভালোবাসাই কীটস-এর জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে অনেকে মনে করেন। ফ্যানি সব সময়ই কীটস-এর মনে একটা সন্দেহ ও শঙ্কার ভাব জাগিয়ে রেখেছেন। বারবার কীটস-এর মনকে অশান্ত করে তুলেছেন। কীটস যখন রোগশয্যায় এবং ইতালীতে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় তখনও নাকি তাঁকে সেজে গুজে যথাপূর্বং আমোদ-ফুর্তি করতে দেখা গেছে। তাছাড়া মনে হয় কীটস যে-সময় ফ্যানির কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করেছিলেন সেই সময় যদি তাঁদের বিবাহ হতো তা হলে হয়তো কীটস-এর জীবন অন্য রকম হয়ে উঠতো। কিন্তু তখন বিবাহে শুধু যে ফ্যানির মা-ই অসম্মত ছিলেন তা-ই নয়, যতদূর মনে হয় ফ্যানিও খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশ্য ফ্যানি ব্রন-এর জীবনী-লেখিকা তাঁকে দোষমুক্ত করতে যথাসাধ্য

চেষ্টা করেছেন। তিনি এ সবের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফ্যানির কাছে কীটস যখন বিবাহ প্রস্তাব করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো-উনিশ। সুতরাং তাঁর স্বাধীন মত ব্যক্ত করার তখন কোনো উপায় ছিল না। তাছাড়া ফ্যানি ছিলেন কিছুটা চাপা প্রকৃতির মেয়ে। তিনি তাঁর মনের সব দুঃখ মনেই চেপে রাখতেন। পাঁচজনের কাছে কখনো প্রকাশ করতেন না। এমন কি পাঁচজনে যাতে তা না-বুঝতে পারে সেজন্যও চেষ্টা করতেন। বলা বাহুল্য এসব কথা আমাদের কাছে হয়তো ততটা বিশ্বাসযোগ্য হতো না যদি না কীটস-এর মৃত্যুর পর কীটস-এর বোনের কাছে লেখা ফ্যানির চিঠিগুলি দেখতাম। এই সময়কার একটি চিঠিতে ফ্যানি ব্রন্ কীটস-এর বোন ফ্যানি কীটস-কে লিখেছেন, 'প্রিয় ফ্যানি, একমাত্র তুমিই শুধু আমার দুঃখ বুঝবে। তাঁর (কীটস-এর) বন্ধুরা ইতিমধ্যে তাঁকে প্রায় ভুলেছে। তাদের প্রথম আঘাত সয়ে গেছে। এবং এ-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাদের ধারণা, আমারও তাদের মতই অবস্থা। অবশ্য তাতে আমি আশ্চর্য হই না। কারণ, আমি সব সময়ই চেষ্টা করেছি আমার মনের ভাব তাদের না-বুঝতে দিতে। তবে তুমি,—যে আমার পরই তাকে ভালবাসতে (আমি অবশ্যই বলবো আমার পরে), তাকে আমি বলতে পারি যে আমি তাকে ভুলি নি, কোনো দিন ভুলতে পারবোও না।'

কীটস-এর বন্ধুদের সম্পর্কে, ফ্যানি যে-কথা লিখেছেন সে-কথা অবশ্য সত্য নয়। কীটস-এর গুণগ্রাহী ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁকে কোনো দিন ভোলেন নি। তাঁরা চিরদিন এই পৃথিবীতে বন্ধুত্বের আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবেন। তাঁরা যদি কীটসকে ভুলে যেতেন তা হলে কীটস-এর

রেজারেক্শন কোনো দিন সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। অন্তত অচিরে যে হতো না সে-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। যাই হোক, ফ্যানির চিঠিপত্র পড়ে এবং তাঁর সম্পর্কে আরো নানা কথা জেনে আমাদের ধারণা হয়েছে যে একেবারে প্রথম থেকে যদি না-ও হয়, অবশেষে তিনি সত্যিই কীটস-কে ভালোবেসেছিলেন। অবশ্য, বলা নিষ্প্রয়োজন, সে-ভালোবাসা কীটস-এর মত আশ্চর্য বা অসাধারণ ছিল না। ভালোবাসার সে-শক্তি, সেই নিবিড় সংবেদনশীল মন ফ্যানি কোথায় পাবেন! আর তাছাড়া ফ্যানি সত্যিই কিছুটা চটুল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন, হয়তো বা একটু অগভীরও। কিন্তু অগভীর চটুল প্রকৃতির মেয়েরা কি ভালোবাসে না?—নিশ্চয়ই বাসে। তবে যতদূর মনে হয় ফ্যানি সে-সময় কীটস-এর বিস্ময়কর প্রতিভা একেবারে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি ভালোবেসেছিলেন তাঁর রূপমুগ্ধ একজন অতি সাধারণ কবিতা-লেখককে। আশ্চর্য প্রতিভাধর কবি কীটস-কে তিনি বুঝতেও পারেন নি, তাঁকে সেভাবে ভালোবাসাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু তবু সব কিছু বিবেচনা করে এ কথা বলতেই হবে যে ফ্যানির প্রেম সম্পূর্ণ সত্য ছিল। কীটস-এর মৃত্যুর পর প্রায় ছ বছর তিনি শোকচিহ্ন ধারণ করে ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি বিয়ে করেছিলেন,—কিন্তু তা কীটস-এর মৃত্যুর বারো বছর পর। একটি স্বাস্থ্যবতী ইওরোপীয় মেয়ের পক্ষে এটি খুব আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। এবং এতে কীটস-এর প্রতি তাঁর প্রেমের সত্যতা অপ্রমাণিত হয় বলেও আমার মনে হয় না।

কীটস অসাধারণ মানুষ, তাঁর প্রেমও ছিল অসাধারণ। ফ্যানি সাধারণ, তাঁর প্রেমও সাধারণ। এই কথাই শুধু আমি বলি। এবং জীবনকে দেখে দেখে একথাও বারবার উচ্চারণ করি ঃ

'প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—।'

Honore´ De Balzac 1799 A. D.-1850 A. D.

বালজাক

প্রতিভা কথাটা বালজাক সম্বন্ধে যেমন নির্ভয়ে ও নিঃসংশয়ে ব্যবহার করা যায় সে-রকম বোধহয় খুব অল্প লেখকের সম্বন্ধেই করা চলে। সত্যিই উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কথা-সাহিত্যিক অনরে দ্য বালজাক (Honore´ de Balzac) এক অসাধারণ সৃজনীপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর মতে শুধু উৎকর্ষ নয়, উর্বরতাও প্রতিভার একটি প্রধান লক্ষণ এবং সে-দিক থেকে বিচার করলে বালজাক-এর সাহিত্য-প্রতিভায় আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বালজাক-এর উর্বরতা সত্যিই বিস্ময়কর। অবশ্য, বলাই বাহুল্য, এই উর্বরতা পুস্তকের সংখ্যায় নির্ণীত নয়। কারণ অনেক সাধারণ লেখক-কেও অনেক সময় অসংখ্য বই লিখতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা দু-একটি মৌলিক রচনার পর হয় নিজেদেরই চর্বিতচর্বণ করেন নয়তো কৌশলে অপরের সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। এইখানেই সত্যিকার প্রতিভা ও সাধারণের তফাত। বালজাক-এর বিপুল সাহিত্য-ভাণ্ডারে অবশ্য চর্বিতচর্বণের চিহ্ন একেবারে নেই এ রকম কথা বলার সাহস ও যোগ্যতা অল্পলোকেরই আছে। তবে এ কথা বোধহয় নির্দ্বিধা ও নিঃসংশয়েই বলা চলে যে, 'লা কমেদি য়্যুম্যান'-এর (La Come´die Humaine) বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যত মৌলিক জীবন্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা একমাত্র শেক্সপীয়রের সাহিত্যে ছাড়া ইওরোপে আর

কারো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ডুমা এক জায়গায় বলেছেন—"ভগবানের পর শেক্সপীয়র-ই সবচেয়ে বড় সৃষ্টিকর্তা।" মনে হয় ডুমা যদি বালজাক-এর সমসাময়িক ও বন্ধু না-হতেন তা হলে শেক্সপীয়রের সঙ্গে বালজাক-এর নামও তিনি নিশ্চয় উল্লেখ করতেন। অবশ্য গোতিয়ে-র মতে বালজাক-এর মত এত জীবন্ত চরিত্র শেক্সপীয়রও সৃষ্টি করেছেন কিনা সন্দেহ।

'লা কমেদি য়্যুম্যান' প্রায় শ'খানেক উপন্যাসের সমষ্টি। এই দীর্ঘ উপন্যাসমালায় প্রায় দু-তিন হাজার চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। তারা সকলেই যে একেবারে বাস্তব চরিত্র তা নয়। কিন্তু বালজাক-এর প্রতিভার স্পর্শে তারা এতই জীবন্ত যে পাঠক বোধহয় তাঁদের হৃদ্-স্পন্দনও অনুভব করতে পারেন। বালজাক এমন বিভোর হয়ে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টি করতেন যে তাঁর নিজের কাছেও বোধহয় তাদের রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ বলে বোধ হতো। অন্তত তাঁর অবচেতন মনে যে তার একটা গভীর ছাপ থেকে যেত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তাঁর 'লা কমেদি য়্যুম্যান'-এ বিয়াঁশোঁ (Bianchon) নামে একজন সৎ সুচিকিৎসকের চরিত্র আছে। বালজাক যখন মৃত্যুশয্যায় তখন নাকি তিনি অসুখের ঘোরে এই বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"বিয়াঁশোঁ-কে ডাকো, বিয়াঁশোঁ-কে ডাকো, সে আমায় বাঁচাতে পারবে।"

বালজাক-কে অনেকে রিয়ালিজমের গুরু মনে করেন। অনেকে আবার তাঁকে স্বভাবত রোমান্টিক মনে করে থাকেন। আসলে তিনি বোধহয় এই দুয়ের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ। কারণ বালজাক-সৃষ্ট অদ্ভুত

ও অপরূপ কল্পনার জগৎ দৃঢ় বাস্তব-সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জীবনকে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছিলেন। আর সেই দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর 'লা কমেদি য়্যুম্যান'-এর মূল ভিত্তি।

'লা কমেদি য়্যুম্যান' উপন্যাসমালা রচনার বিরাট পরিকল্পনা অবশ্য বালজাক-এর মাথায় প্রথমে আসে নি। যৌবনে তিনিও অন্যান্য লেখকের মত যথারীতি পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেই খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যে ইতিমধ্যে সে-যুগের মহৎ মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত করে ফেলেছেন সে-খেয়াল তাঁর ছিল না। তাঁর বয়স যখন চৌত্রিশের মত সেই সময় তাঁর হঠাৎ একদিন মনে হয় যে তাঁর সমগ্র রচনা পৃথক পৃথক ভাবেই সংযুক্ত করা যায়। এবং সেই সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করার এক বিরাট পরিকল্পনাও তাঁর মনে আসে। এই চিন্তায় তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে তাঁর ছোট বোনের কাছে ছুটে গিয়ে নাকি বলেন, শোনো, তোমরা আমাকে অভিনন্দিত করো। অচিরেই আমি বিরাট প্রতিভায় পরিণত হতে চলেছি। এবং এর পর হতে সত্যিই তিনি এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অশেষ শ্রম সহকারে একটির পর একটি উপন্যাস লিখে গেছেন। অবশ্য তিনি এই পর্যায়ে যতগুলি উপন্যাস লিখবেন স্থির করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা লিখে যেতে পারেন নি। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তা অসমাপ্তই থেকে গেছে। কিন্তু যতটা তিনি লিখতে পেরেছিলেন তা যেমনই বিপুল তেমনই বিস্ময়কর।

বলা বাহুল্য, স্বতন্ত্রভাবেও বালজাক-এর উপন্যাসগুলির রসাস্বাদন সম্ভব। এগুলির মধ্যে 'পের গোরিও'-কেই অনেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করে থাকেন। এই উপন্যাসটি চিত্তাকর্ষক গল্প, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে অপূর্ব। বালজাক-এর রচনার অনেক দোষত্রুটি হতেই এটি মুক্ত। 'লা কমেদি য়্যুম্যান'-এর মূল কথাটিও বোধহয় এতে বীজাকারে প্রকাশিত। সেজন্য যাঁরা বালজাক-এর শুধুমাত্র একটি উপন্যাস পড়েই তাঁর রচনার সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হতে চান তাঁদের এটি পড়া উচিত। 'লা কমেদি য়্যুম্যান' উপন্যাসমালার অন্তর্গত হলেও, বলা বাহুল্য, 'পের গোরিও'-র পৃথকভাবেও বিশেষ আবেদন আছে এবং এটি নিঃসন্দেহে বালজাক-এর এক অসাধারণ সৃষ্টি।

১৭৯৯ সালের ১৬ই মে ফ্রান্সের তূর-এ (Tours) বালজাক-এর জন্ম হয়। সেদিন ছিল 'সেণ্ট অনরে'-র দিন (Saint Honoré's Day)। তাই তাঁর নাম রাখা হয় অনরে। অনরে বালজাক অবশ্য পরে নিজেকে অভিজাত প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর নামের সঙ্গে একটি 'দ্য' যোগ করেছিলেন। অনরে দ্য বালজাক-ই কথাশিল্পী হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত।

অল্প বয়সে ছাত্র হিসাবে বালজাক কিন্তু মোটেই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁকে নিয়ে শিক্ষকদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। তাঁর বাবাকে চিঠি লিখে একবার তাঁকে স্কুল থেকে বাড়িতে পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছিল। বালজাক পাঠ্যপুস্তক একেবারেই পড়তে

চাইতেন না। অপাঠ্য পুস্তকের প্রতিই ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তিনি যে কোনোদিন তাঁর স্কুলের সাধারণ শেষ পরীক্ষাটাও পাস করতে পারেন এমন আশাও তাঁর শিক্ষকরা করতেন না। কিন্তু সকলকে আশ্চর্য করে একদা বালজাক তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে গেলেন। অতঃপর অভিভাবকদের উপদেশ অনুযায়ী তিনি আইন পড়া শুরু করলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ ইচ্ছে ছিল যে তিনি আইনজীবী হবেন। কিন্তু বালজাক-এর তা হওয়ার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে একদিন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। জানালেন যে তিনি আইন-ব্যবসায়ী হবেন না,—লেখক হবেন। অনেক ঝগড়াঝাটি রাগারাগির পর শেষ পর্যন্ত তাঁর বাবা তাঁকে মাত্র দু বছরের সময় দেন। এর মধ্যে যদি তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন তবেই তাঁরা তাঁর লেখকের বৃত্তি অনুমোদন করবেন, নচেৎ তাঁকে আবার সলিসিটরের অফিসে ফিরে আসতে হবে। বালজাক তাতেই সম্মত হলেন।

অত্যন্ত সামান্য আসবাবপত্রে সজ্জিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বালজাক সাহিত্য-সাধনা শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি প্রথমে 'ক্রম্‌ওয়েল্‌' নামে একটি ট্রাজিডি রচনা করলেন। অনেক আশা নিয়ে দুরুদুরু বুকে একদিন তিনি যথাসময়ে সেই ট্রাজিডি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সাহিত্যরসিক বন্ধুদের পড়ে শোনালেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে মন্তব্য করলেন যে নাটকটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বালজাক-এর প্রথমে তা বিশ্বাস হলো না। সুবিচারের জন্য তিনি পলিটেক্‌নিক্‌ স্কুলের

জনৈক প্রবীণ অধ্যাপকের কাছে লেখাটি পাঠালেন। অধ্যাপকের মন্তব্য আরো নৈরাশ্যকর হলো। তিনি জানালেন বালজাক জীবনে যা-খুশি বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন, শুধু সাহিত্য-রচনার চেষ্টা যেন তিনি না করেন। ও কাজ তাঁর দ্বারা হবে না।

অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বালজাক আবার পারীতে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি ঠিক করলেন, ট্রাজিডি-রচনায় তিনি যখন সফল হতে পারলেন না তখন তিনি ঔপন্যাসিক হবেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই স্কটের প্রেরণা ও আদর্শে দু-তিনটি উপন্যাসও লিখে ফেললেন। কিন্তু এদিকে পূর্ব কথামত দু বৎসরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বাবা-মা তাঁকে অচিরে সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করে পারী হতে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁর সস্তা উপন্যাসের এক প্রকাশকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এবং তাঁর সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যেই ছদ্মনামে তিনি অনেকগুলি এই রকম সস্তা রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশ করে ফেললেন। লিখে এবার অর্থ উপার্জন হতে লাগলো। তার ফলে ধীরে ধীরে তাঁর আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এলো।

বালজাক-এর স্বনামে প্রকাশিত প্রথম সিরিয়াস উপন্যাসের নাম হচ্ছে 'ল্যে স্যুয়াঁ' (Les Chouans)। তখন তাঁর প্রায় তিরিশ বছর বয়স। এতদিনের বেনামে সাহিত্যচর্চা তাঁর ব্যর্থ হয় নি। অনর্গল লিখে-লিখে ইতিমধ্যেই সাহিত্য-রচনার কলা-কৌশল তাঁর হয়ে গেছে। তাই নিজের নামে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসেই তিনি খ্যাতি অর্জন করে ফেললেন। এবং এর পর হতে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত

দীর্ঘ একুশ বছর তিনি অদ্ভুত শ্রমনিষ্ঠার সঙ্গে একের পর এক অজস্র গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

বালজাক খুব পরিশ্রম করে লিখতেন। সহজে অবলীলাক্রমে তিনি লিখতে পারতেন না। সাধারণত প্রথমে তাঁর যা মনে আসতো তা-ই তিনি ভাঙা ভাঙা বাক্যে যেমন করে হোক দ্রুতহাতে লিখে নিতেন। এবং সেই লেখাই তিনি প্রেসে পাঠিয়ে দিতেন। প্রেস হতে খুব বড় কাগজে তাঁকে প্রুফ পাঠানো হতো। সেই প্রুফের ওপর অসংখ্য চিহ্ন দিয়ে তার সঙ্গে তিনি আবার দু-তিন গুণ লেখা যোগ করতেন। এমনিভাবে পাঁচ-সাত বার প্রুফের ওপর লিখে ও সংশোধন করে তবে তিনি সন্তুষ্ট হতেন। তারা, তীর, ক্রস্, চন্দ্র, সূর্য, রোমান সংখ্যা প্রভৃতি অসংখ্য চিহ্ন-সমন্বিত হিজিবিজি লেখায় ভর্তি তাঁর প্রুফের পাঠোদ্ধার করা একটা বিষম কঠিন ব্যাপার ছিল। সেজন্য কোনো কম্পোজিটর তাঁর লেখা সহজে কম্পোজ করতে চাইতেন না। প্রকাশকও অসন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা এটা সহ্য করে যেতেন।

এত পরিশ্রম করে লেখা সত্ত্বেও বালজাক-এর লেখার স্টাইল তেমন ভালো ছিল না। তাঁর একটা প্রধান দোষ বোধহয় তিনি অনেক সময়ই প্রয়োজনের চেয়ে বেশী লিখতেন। ভাষায়ও নাকি তাঁর কিছু কিছু ভুল থাকতো।

বালজাক গভীর রাত্রে লিখতেন। সন্ধ্যার পর সামান্য কিছু আহার করেই তিনি শুয়ে পড়তেন। রাত্রি একটার সময় চাকর তাঁকে

জাগিয়ে দিতো। তিনি উঠে ধবধবে পরিষ্কার পোশাক পরে তারপর লেখা শুরু করতেন। বালজাক-এর একটা অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে লেখার সময় লেখকের কালিমাহীন পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা প্রয়োজন। নারীসম্ভোগ হতেও সে-সময় তাঁদের বিরত থাকা আবশ্যক। এবং সত্যিই যে-কদিন তিনি গভীর কিছু লেখায় ব্যাপৃত থাকতেন সে-কদিন অত্যন্ত মিতাহার ও মিতাচারে দিন কাটাতেন। অবশ্য একটি গ্রন্থ সমাপ্ত করে কিছুদিন তিনি আবার আহারে-বিহারে খুব অসংযতও হয়ে উঠতেন। বিলাসব্যসন ও বাবুয়ানায় সে সময় নাকি একেবারে তিনি নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

মনে হয় স্বভাবত তিনি সংযমী ছিলেন না। শুধু লেখার জন্যই সংযম পালন করতেন। যে-সময় তিনি লিখতেন না সে-সময় তিনি দেশের এবং বিদেশেরও নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। এবং যেখানে যেতেন উল্লেখযোগ্য যা দেখতেন তারই নোট রাখতেন। পরে লেখার সময় সেইসব মালমসলা তিনি কাজে লাগাতেন।

কাপের পর কাপ কড়া কফি খেয়ে তিনি সারারাত লিখে যেতেন। সকাল সাতটার সময় লেখা ছেড়ে উঠে স্নান করে কিছু আহার করতেন। আটটার সময়ই প্রকাশক ও পত্রিকার অফিসের লোক এসে তাঁকে রাশিকৃত প্রুফ দিয়ে যেতেন। অতঃপর তিনি সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত অনলসভাবে সেই প্রুফের ওপর কাজ করে যেতেন। এর মধ্যে দুপুরে শুধু কিছুক্ষণ খাওয়ার সময় বাদ যেতো।

এমনিভাবে লিখে উপার্জন তাঁর যথেষ্টই হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বালজাক সচ্ছলতার মুখ কখনো দেখেন নি। তিনি অসম্ভব খরচে-প্রকৃতির লোক ছিলেন। সেজন্য সব সময়ই দেনায় আকণ্ঠ ডুবে

থাকতেন। পাওনাদারদের তাগাদায় সময়-সময় তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। এ বিষয়ে দস্তয়েভ্স্কির সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে। তবে দস্তয়েভ্স্কি নিজের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও অনেক খরচ করতেন। কিন্তু বালজাক-এর বোধহয় এই সব কর্তব্যবোধের বালাই ছিল না। তিনি তাঁর খেয়ালখুশি ও বিলাস-ব্যসনের জন্যই সব ব্যয় করতেন। নিজেকে অভিজাত প্রমাণ করার হাস্যকর প্রয়াসের জন্যও তাঁর ব্যয় কম হতো না। পারীতে তিনি হাজার হাজার টাকার সৌখিন দ্রব্য কিনছেন, ওদিকে দেশে তাঁর মা অনাহারের সম্মুখীন হয়ে অর্থের জন্য তাঁর কাছে চিঠি লিখে ব্যর্থ হচ্ছেন এ রকম ঘটনাও তাঁর জীবনে দেখা গেছে।

সম্পাদক ও প্রকাশকদের সঙ্গে বালজাক-এর সম্পর্ক বিশেষ মধুর ছিল না। তাঁরাও তাঁকে চুক্তিমত টাকা অনেক সময় দিতেন না, তিনিও বহু সময় চুক্তি অনুযায়ী লেখা দিতে পারতেন না। হয়তো কারো সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি একটা কিছু লিখতে শুরু করেছেন এই সময় আর একজন হয়তো তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়ার লোভ দেখালেন। অমনি বালজাক পূর্বচুক্তির লেখা অর্ধসমাপ্ত রেখেই নতুন লেখা তাড়াতাড়ি লিখে ফেললেন। এ রকম ঘটনা তাঁর জীবনে বহুবার হয়েছে।

অর্থ বালজাক-এর জীবনে ও সাহিত্যে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে আছে দেখা যায়। অবশ্য তরুণ বয়সে তিনি তাঁর বোনকে নাকি একদা বলেছিলেন, জীবনে তাঁর প্রধানতম কামনা হচ্ছে যশ ও প্রেম।

বলা বাহুল্য, যশ বালজাক অপর্যাপ্ত পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিকার ভালোবাসা কি তিনি জীবনে কোনো দিন পেয়েছিলেন? বোধহয় একবার পেয়েছিলেন। এবং তা তাঁর তরুণ বয়সেই, যখন তিনি সম্পূর্ণ অখ্যাত ও অবজ্ঞাত।

যে-সময় বালজাক ছদ্মনামে অজস্র সস্তা রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে চলেছেন এটা সেই সময়কার কথা। তাঁদের ধনী প্রতিবেশী, অনেকগুলি সন্তানের জননী মাদাম দ্য বেরনি-র (Madame de Berny) সঙ্গে এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ই অচিরে প্রেমে পরিণত হয়। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময় বালজাক-এর বয়স বোধহয় তেইশ-চব্বিশ বছর এবং মাদাম দ্য বেরনি-র বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু আশ্চর্য, বয়সের এই পার্থক্য তাঁদের ভালোবাসায় কোনোরূপ বাধা জন্মাতে পারে নি। তাঁরা পরস্পরকে গভীরভাবেই ভালোবেসে ফেলেন এবং মাদামের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁদের এ ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ ছিল।

মাদাম দ্য বেরনি শুধু বালজাক-এর প্রিয়া ছিলেন না, তিনি তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত হিতৈষী বন্ধুও ছিলেন। একবার মাদাম তাঁকে ব্যবসা করার জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার ফ্রাঁ সাহায্যও করেছিলেন। ব্যবসা-বুদ্ধিহীন অমিতব্যয়ী বালজাক অবশ্য তা অল্পদিনেই নষ্ট করে ফেলেন। বালজাক-এর স্নেহাস্পদ বন্ধু তেয়ফিল গোতিয়ে (Théophile Gautier) লিখেছেন, উপযুক্ত অর্থের অভাবের জন্যই বালজাক

ব্যবসায়ে সফলকাম হতে পারেন নি। কিন্তু সেটা মনে হয় ঠিক নয়। আসলে বালজাক-এর মত বে-হিসাবী খরচে মানুষের পক্ষে ব্যবসা করাই সম্ভব ছিল না।

যাই হোক, মাদাম দ্য বেরনি-র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বালজাক-এর জীবনে অনেক সাহায্য ও প্রেরণা জুগিয়েছে। অনেকে এমন কথাও মনে করেন যে সেই তরুণ বয়সে বালজাক যদি মাদাম দ্য বেরনি-র ঐ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা না পেতেন তা হলে তাঁর পক্ষে এত বড় হয়ে ওঠা সম্ভব হতো না। এই ভালোবাসার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েই তিনি আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিলেন এবং বৃহৎ ও মহৎ কিছু করবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

মাদাম দ্য বেরনি-র পর বালজাক-এর জীবনে আসেন মার্কিজ্ দ্য কাস্ত্রিয় (Marquise de Castries)। যদিও বালজাক তখনো তরুণ কিন্তু সে সময়ই তিনি বেশ সুখ্যাত। এবং এই খ্যাতির জন্য, যেমন সাধারণত হয়, তিনি অনেক নতুন বন্ধু ও বান্ধবী লাভ করেছিলেন। অনেক ধনী অভিজাত নরনারীও এঁদের মধ্যে ছিলেন। মাদাম দ্য কাস্ত্রিয় তাঁদের অন্যতম। বালজাক-এর প্রতিভা ও খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে পত্র লেখেন। এই ভাবেই তাঁদের মধ্যে পরিচয়ের সূত্রপাত। মাদাম দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। বালজাক নাকি তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রত্যহ তাঁর কাছে যেতেন। এর ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু এ প্রেম একেবারেই সার্থক হয় না। অচিরেই একদিন বোঝা গেল যে মাদাম দ্য কাস্ত্রিয় কদাচ বালজাক-এর মত চাবাড়ে চেহারার একজন প্রেমিক চান নি। তিনি

চেয়েছিলেন একজন বিখ্যাত তরুণ লেখক তাঁর ভক্ত থাকুক। আর শুধুমাত্র সেইজন্যই বোধহয় তিনি বালজাককে প্রশ্রয় দিতেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ ধরনের কাজে বিপদ আছে। প্রেম নিয়ে খেলা করা চলে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে সাধারণত প্রেম এক জায়গায় স্থির থাকে না। তা ধীরে হোক, বা দ্রুত হোক, ক্রমশ অগ্রসর হয় এবং উদগ্রভাবে এক পরমক্ষণের কামনা করে। সেই চরম মুহূর্তে নিশ্চয়ই মাদাম রূঢ়ভাবে বাধা দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা জেনিভায় ঘটে। সে-সময় মাদাম দ্য কাস্ত্রিয় তাঁর কাকার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলেন। এবং বালজাকও তাঁর ইতালী যাওয়ার পথে কিছুদিন ওখানে ছিলেন। তিনি ও মাদাম একদা প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঠিক কী হয়েছিল কেউ জানে না। কয়েক ঘণ্টা পর সাশ্রুনেত্রে বালজাক-কে একা ফিরে আসতে দেখা যায়। খুব সম্ভব তাঁর আবেদন অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যাই হোক, অতঃপর ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত বালজাক ইতালী ভ্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করে পারী-তে ফিরে আসেন এবং এইখানেই এ ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়।

এরপর ইভলিন-এর কথা।

বলা বাহুল্য বালজাক-এর কাছে তাঁর অনুরাগী পাঠক-পাঠিকার অসংখ্য চিঠিপত্র আসতো। একবার ওডেসা থেকে এক ভদ্রমহিলার চিঠি এলো। প্রথমে চিঠিতে কোনো পরিচয় বা নাম ছিল না। পরে জানা গেল পত্র-লেখিকা একজন অভিজাত ধনী পোল্-রাশিয়ান

জমিদার-গৃহিণী। তাঁর নাম ইভলিন হানস্কা। বালজাক তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ চালাতে লাগলেন। ক্রমে এই পত্রালাপের ভিতর দিয়েই তাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

কিছুকাল পর মাদাম হানস্কা তাঁর রুগ্ন স্বামী ও কন্যাসহ সুইট্জারল্যাণ্ডে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি বালজাক-কে আমন্ত্রণ জানালেন। পাঁচ দিন বালজাক সেখানে কাটান। তার মধ্যেই মাদাম হানস্কা-এর তিনি প্রেমিক হয়ে উঠলেন। মাদাম হানস্কা যদিও তখন ত্রিশ অতিক্রম করে গেছেন এবং বয়সে বালজাক-এর চেয়ে সামান্যই ছোটো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রূপ-যৌবন ও আকর্ষণীশক্তি তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল। পাঁচদিন তাঁদের খুব আনন্দে কাটলো। পরের শীতে তাঁরা আবার জেনিভায় মিলিত হবেন এই কথা স্থির করে বালজাক পারী-তে ফিরে এলেন এবং পূর্বকথামত শীতের সময় ঠিক আবার জেনিভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছ সপ্তাহ বিচিত্র প্রেমলীলায় অতিবাহিত হলো। এবার, মাদাম হানস্কা-এর বৃদ্ধ ও রুগ্ন স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বালজাক-কে বিয়ে করবেন এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে বালজাক ফিরলেন। কিন্তু বেচারি বৃদ্ধ ও রুগ্ন স্বামী অচিরে মরবার কোনোই লক্ষণ দেখালেন না। সুতরাং প্রতীক্ষায় দিন কাটতে লাগলো।

ইতিমধ্যে পারীতে আরো কয়েকটি প্রেমের ব্যাপারে বালজাক জড়িয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে সে-কথা ইভলিন-এর কানেও ওঠে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বালজাক-কে চিঠি লেখেন এবং জানান যে তিনি তাঁর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না। ভীত উদ্বিগ্ন বালজাক দু হাজার ফ্রাঁ ধার করে ভিয়েনায় গিয়ে ইভলিন-এর সঙ্গে

দেখা করেন এবং অনেক কষ্টে অবশেষে সব মিটমাট করতে সমর্থ হন। অতঃপর পারী-তে ফিরে এসে আবার তিনি ইভলিন-কে বিবাহ করার আশায় দিন গুণতে থাকেন।

কিন্তু দিন আর আসে না। ইভলিন-এর স্বামী মসিয়ো হানস্কা-র মরার কোনো লক্ষণই নেই।

দীর্ঘ আট বছর এমনি আশা-নিরাশার মধ্যে কাটলো। তারপর হঠাৎ একদিন মসিয়ো হানস্কা মারা গেলেন। বালজাক ভাবলেন এতদিন পর তাঁর আশা এবার পূর্ণ হবে; তিনি ইভলিন-কে পাবেন এবং তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তিরও অধিকারী হবেন। কিন্তু তা হলো না। শেষ পর্যন্ত ইভলিন তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলেন। তিনি চিঠিতে জানালেন, বালজাক-এর অবিশ্বস্ততা ও অমিতব্যয়িতা তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। নিরাশ ও নিরুপায় বালজাক অবশেষে আবার সেণ্ট পিটার্সবার্গে গিয়ে ইভলিন-এর সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ আট বছর পর তাঁদের দেখা হলো। দুজনেই এখন মধ্যবয়সী এবং স্থূল। বালজাক-এর বয়স তেতাল্লিশ ও ইভলিন-এর বিয়াল্লিশ। বালজাক ইভলিন-কে অনেক করে বোঝালেন। বালজাক-এর প্রাণ ও প্রতিভার স্পর্শে ইভলিন সম্মোহিত হলেন এবং আবার বিবাহে সম্মত হলেন।

কিন্তু কী জানি কেন, শেষ পর্যন্ত এই বিবাহ হতে হতে আরো সাত বছর কাটলো।

খুব সম্ভব বালজাক-কে বিয়ে করতে ইভলিন-এর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। অমন চাষাড়ে চেহারার অমিতব্যয়ী ঋণগ্রস্ত একজন লোককে কোন্ বয়স্কা মহিলাই বা বিয়ে করতে চান? তাছাড়া

বালজাক-কে ইভলিন কোনো দিন সত্যি ভালোবেসেছিলেন বলেও মনে হয় না। মনে হয় তিনি শুধুমাত্র তাঁর লেখার অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর অসামান্য খ্যাতির জন্য তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর বালজাক-এর আগ্রহাতিশয্যেই শুধু সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর বিয়ে তো এক কথা নয়, বিশেষত বেশী বয়েসে মন যখন হিসেবী হয়ে ওঠে।

সুতরাং অনুমান করা হয় একমাত্র মাদাম দ্য বেরনি ছাড়া আর কোনো নারীই বালজাক-কে ভালোবাসেন নি। তিনি ছাড়া আর যাঁরা তাঁর জীবনে এসেছেন তাঁরা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, তাঁর খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই এসেছেন। সত্যি সত্যি কেউ ভালো-বাসেন নি। ইভলিন যে শেষ পর্যন্ত বালজাক-কে বিয়ে করেন সেটা যতদূর মনে হয় ভালোবাসার জন্য নয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও নানা কারণে ইদানীং বালজাক-এর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তিনি হয়তো আর বেশী দিন বাঁচবেন না—এই রকমই একটা আশঙ্কা করছিলেন ইভলিন,—যা পরে সত্যও হয়েছিল। সত্যিই বিবাহের কয়েক মাস পরেই বালজাক-এর মৃত্যু হয়। সুতরাং অবশেষে ইভলিন যে বালজাক-কে বিয়ে করলেন সেটা বোধহয় কিছুটা তাঁর প্রতি করুণাবশত, কিছুটা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামের সঙ্গে নিজের নামটাও জড়িত থাকবে এই আশায় ;—প্রেমের জন্য নয়।

অবশেষে স্বাভাবিক ভাবেই আর একটি কথা আসে। বালজাকও কি ইভলিন-কে সত্যি ভালোবেসেছিলেন? যদি বেসে থাকেন তা হলে

সে-ভালোবাসাই বা কেমন?—বালজাক-এর একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মনে করতেন তাঁর প্রেমে কোনো খাদ ছিল না এবং সে-প্রেম প্রধানত প্লেটনিক। অবশ্য বালজাক-এর ভগ্নী মাদাম দ্য স্যুর্‌ভিল একথা শুনে নারীর স্বভাবসুলভ রহস্য ও সংযমের সঙ্গে শুধু মৃদু মৃদু হাসতেন। কে বলতে পারে এই রহস্যময় হাসির প্রকৃত অর্থ কী!

১৮৫০ সালের ১৭ই আগস্ট বিবাহের কয়েকমাস পরেই বালজাক-এর মৃত্যু হয়। দীর্ঘদিনের অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অত্যন্ত কফি পান ইত্যাদি নানা কারণে তাঁর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু চিরদিন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী বালজাক-এর যে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে একথা তাঁর স্বজন-বন্ধুরা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি নিজেও তা ভাবতে পারেন নি। তাঁর পিতার মত তিনিও দীর্ঘজীবী হবেন—এই ছিল তার বিশ্বাস। তখনো স্ত্রী ও গুটিদুয়েক সন্তান নিয়ে একটি সুখ ও শান্তিময় সংসারের স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে। লেখারও আরো অনেক পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সে-সব কিছুই হলো না। অকালে মৃত্যু এসে সব ভেঙে দিয়ে গেল।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁর স্নেহাস্পদ বন্ধু তেয়ফিল গোতিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু দেখা হলো না। কেবল বালজাক-এর হাতের লেখা একছত্রের একটি চিঠি পেলেন তিনি। তাতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে শুধু লেখা 'আমি এখন আর লিখতেও পারি না,—পড়তেও পারি না।'—চিঠির কথাগুলি যেন গোতিয়ে-র বুকে এসে

বিঁধলো। চিরদিনের অক্লান্ত লেখক বালজাক-এর এই মর্মবেদনা তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন। তাঁর মনে হলো এ যেন খ্রীস্টেরই সেই অন্তিম মর্মন্তুদ চীৎকার: 'এলি, এলি, লামা সাবাখ্‌থানি!' (Eli, Eli, lama sabacthani!)

Charles Dickens 1812 A.D.-1870 A.D.

চার্লস্ ডিকেন্স

অনেকের মতে চার্লস্ ডিকেন্স-ই হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ থাকতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, উপন্যাস লেখকের যা প্রধান গুণ সেই গল্প বলার ক্ষমতা ও চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার শক্তি তাঁর অসাধারণ ছিল।

•

বলা বাহুল্য, ডিকেন্স-এর লেখার আরও অনেক গুণ ছিল এবং ত্রুটিও। সে-সব আলোচনা এখানে আমার করার ইচ্ছে নেই। তাঁর সাহিত্য-বিচারের জন্য এ প্রবন্ধ নয়। আমি যথারীতি শুধু তাঁর জীবন ও তাঁর প্রেম সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে সামান্য দু-চার কথা এখানে লিখবো।

১৮১২ সালে ইংল্যাণ্ডের পোর্টসী-তে চার্লস্ ডিকেন্স-এর জন্ম হয়। জন ডিকেন্স ও এলিজাবেথ ডিকেন্স-এর তিনি দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র। তাঁর বাবা জন ডিকেন্স নেভি পে-অফিসে সামান্য কেরানীর কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং সেজন্য সব সময়ই অভাব ও ধারদেনায় বিশেষভাবে জর্জরিত থাকতেন। দেনার দায়ে তাঁকে কয়েকবার জেলেও যেতে হয়েছে। সংসারের এই অনটন ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেই চার্লস্ ডিকেন্স মানুষ হয়েছেন। এর ফলে বাল্যে পড়াশোনাটাও তাঁর ভালোমত হয় নি।

বারো বছর বয়সেই তাঁকে একবার স্কুল ত্যাগ করে ফ্যাক্টরির কাজে ঢুকতে হয়েছিল। সপ্তাহে ছ শিলিং করে পেতেন তিনি সেখানে। এই সামান্য অর্থই তখন তাঁদের সংসারের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কাজ অবশ্য তাঁর খুব কঠিন ছিল না। শিশি-বোতল পরিষ্কার করে তাতে লেবেল লাগাতে হতো তাঁকে। কিন্তু এত অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে তাঁকে যে বাধ্য হয়ে ফ্যাক্টরির কাজ করতে হচ্ছে, এই অনুভূতিটা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়া দিত। এটা তাঁর এতই মনোবেদনার কারণ হয়েছিল যে, উত্তরজীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছেও তিনি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইতেন না।

সৌভাগ্যক্রমে এ কাজ তাঁকে বেশী দিন করতে হয় নি। তাঁর বাবার সঙ্গে ফ্যাক্টরির মালিকদের ঝগড়া হওয়ায় তাঁর চাকরি যায় এবং জন ডিকেন্স তাঁর মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর পর পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ডিকেন্স স্কুলে পড়েন। অতঃপর চিরদিনের জন্য তিনি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি এক আইন-ব্যবসায়ীর আফিসে সংবাদবাহকের কাজ নেন। অবশ্য এ কাজও তাঁকে বেশী দিন করতে হয় নি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর বাবা তাঁকে আর একজন আইনজীবীর অফিসে কেরানীর কাজ জুটিয়ে দেন। সপ্তাহে দশ শিলিং করে পেতেন তিনি এখানে। অল্পদিনের মধ্যে একাজও তাঁর অত্যন্ত একঘেয়ে ও খারাপ লাগতে থাকে। তাঁর মত ব্যক্তির কাছে তা লাগা অস্বাভাবিকও ছিল না। তা-ছাড়া কোনো ভবিষ্যতও ছিল না সে কাজে। সুতরাং অন্য কোনো বৃত্তিতে জীবনে উন্নতি করার আশায় তিনি অবসর সময়ে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে থাকেন এবং কিছুকাল পর রিপোর্টারের কাজ গ্রহণ করেন।

এই কাজে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর বেশ সুনাম হয়। এই সময় তিনি 'দি মান্থলি ম্যাগাজিন' ও 'দি মর্নিং ক্রনিক্ল্'-এ ধারাবাহিক ভাবে লণ্ডন-জীবনের কতকগুলি নকশা লেখেন। এজন্য অবশ্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক পান নি। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই লেখাগুলি একজন প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং ডিকেন্স-এর চতুর্বিংশতিতম জন্মদিবসে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের জন্য তাঁকে দেড়শ পাউণ্ড দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, প্রকাশক তাঁকে আরও লেখার জন্য অনুরোধ জানান।

ইতিমধ্যে আরও একজন প্রকাশক তাঁকে একটি স্পোর্টিং ক্লাব সম্বন্ধে কিছু সরস গল্প লিখতে অনুরোধ করেন। ডিকেন্স প্রথমে জানান যে, এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান নেই। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থের প্রলোভন এড়াতে না পেরে তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হন।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'দি পিক্উইক্ পেপার্স'-এর জন্মকাহিনী। পুস্তকাকারে 'দি পিক্উইক্ পেপার্স' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডিকেন্স বিখ্যাত হয়ে যান। অবশ্য সমালোচকরা তাঁর লেখার প্রশংসা করেন নি। এমন কি কেউ কেউ তার উল্টোটাই করেছিলেন। 'দি কোয়ার্টারলি রিভিউ' লিখেছিলেন "এই লেখকের ভবিষ্যৎ বলা মোটেই শক্ত নয়। ইনি জলন্ত হাউই-এর মত উপরে উঠেছেন এবং অচিরেই পুড়ে-যাওয়া হাউই-এর কাঠির মত ভূতলশায়ী হবেন।"

বলা বাহুল্য তা হয় নি।

'দি পিক্‌উইক্‌ পেপারস্'-এর পর 'অলিভার টুইস্ট।' তারপর 'নিকোলস নিকলবি।' এমনি করে দিনে দিনে ডিকেন্স জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। বস্তুত তাঁর মত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইংল্যাণ্ডে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। শুধু তাঁর দেশে নয়, আমেরিকাতেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। ১৮৪২ সালে তিনি যখন সস্ত্রীক আমেরিকায় যান তখন জনসাধারণ তাঁকে যেভাবে সংবর্ধিত করেন তা অভূতপূর্ব। ফিলাডেলফিয়া শহরে তাঁর অনুরাগী পাঠকদের সঙ্গে করমর্দন করতেই তাঁর পুরো দু-ঘন্টা কেটে যায়।

ডিকেন্স তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে 'ডেভিড কপারফিল্ড'-কেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং আমার মনে হয়, এ বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচকই তাঁর সঙ্গে একমত।

বলা বাহুল্য, ডিকেন্স যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও সামাজিক। তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীরা তাঁর স্বভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তবে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তাঁর রুচির প্রশংসা কেউই বড় একটা করেন নি। তিনি ছিলেন একটু বাবু প্রকৃতির মানুষ। পরিণত বয়স পর্যন্তও তিনি বেশ সাজগোজ করতে ভালোবাসতেন। যৌবনে তিনি ভেলভেটের কোট, রঙচঙে নেকটাই, সাদা টুপি প্রভৃতি বিশেষ পছন্দ করতেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে কিছুটা স্থূলতা ও ছেলেমানুষি প্রকাশ পেত এবং অনেক মার্জিতরুচি ভদ্রলোকের চোখে তা বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকত। কিন্তু পোশাক যেমনই হোক, তাঁর চেহারার বেশ একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল। খুব লম্বা-চওড়া না হলেও তাঁকে সুরূপই বলা চলত। বিশেষ করে তাঁর চোখ দুটি ছিল ভারি

সুন্দর। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও নারীর প্রকৃত প্রেম তাঁর ভাগ্যে তেমন জোটে নি।

সতেরো বছর বয়সে তরুণ চার্লস্ এক ব্যাঙ্ককর্মচারীর মেয়ে মেরিয়া বিডনেল-এর প্রেমে পড়েন। অবশ্য রূপ ও যৌবন ছাড়া আকর্ষণ করার মত মেরিয়ার আর কোনো সম্পদ ছিল না। তিনি ছিলেন কিছুটা আমুদে ধরনের এবং মনে হয় চার্লস্কে খুবই প্রশ্রয় দিতেন তিনি। তাইতেই ভুলে ছিলেন চার্লস। বিচার-বিবেচনা করার বয়স তখন তাঁর নয়। আর কল্পনাপ্রবণ মানুষ কবেইবা বিচার করে ভালোবেসেছে।

সে সময় ডিকেন্স সামান্য চাকরি করতেন এবং প্রায় কপর্দকশূন্য ছিলেন। সুতরাং তাঁকে বিয়ে করার কোনো উদ্দেশ্যই মেরিয়ার ছিল বলে মনে হয় না। শুধু একটু খেলা ও খেলানো, এই বোধহয় ছিল তাঁর ইচ্ছে। তাই বছর দুয়েক পর যথারীতি এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। দুজনে দুজনার চিঠিপত্রও ফেরত দিয়ে দেন। তরুণ চার্লস্ খুবই আঘাত পান এতে। তিনি ভেবেছিলেন, সে-বয়সে যা স্বাভাবিক, এর ফলে তাঁর বুক বোধহয় ভেঙে যাবে। কিন্তু বিধাতাকে ধন্যবাদ, সত্যি সত্যি তাঁর বুক ভাঙে নি।

১৮৩৬ সালে 'দি পিক্উইক্ পেপার্স' প্রকাশের কয়েকদিন পূর্বে ডিকেন্স তাঁর এক সহকর্মী জর্জ হগার্থ-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা কেট-কে বিয়ে করেন।

যাই হোক, কেট-কে বিয়ে করে কিন্তু ডিকেন্স শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পারেন নি। তিনি স্পষ্ট লিখে গিয়েছেন যে, কেট নম্র ও 'অনুগত

হলেও তাঁকে বুঝবার মত বুদ্ধি ও হৃদয় কেট-এর একেবারেই ছিল না। একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্যতারও বিশেষ অভাব ছিল তাঁর মধ্যে। তাছাড়া কেট কোনো দিন ডিকেন্সকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। বিবাহের পূর্ব থেকেই ডিকেন্স-এর প্রতি তাঁর মনোভাবে উষ্ণতার অভাব দেখা যায়। অন্তত ডিকেন্স সেই রকমই অভিযোগ করেছেন। ডিকেন্স-কে যে তিনি বিয়ে করেছিলেন, সেটা খুব সম্ভব এইজন্য যে, পিতার আটটি কন্যার তিনি ছিলেন অন্যতমা; এর চাইতে ভালো বিয়ের বিশেষ সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। আর তখনকার দিনে বিয়ে করা ছাড়া মেয়েদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না বললেই চলে। বিশেষত তার মত মেয়ের। সুতরাং বলাই বাহুল্য, প্রথম থেকেই এই বিবাহ সুখের হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

এই বিবাহের কিছুকাল পর ডিকেন্স কেট-এর ছোট বোন মেরি হগার্থ-কে তাঁদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানান এবং মেরি এসে তাঁদের কাছে থাকেন। মেরি-কে ডিকেন্স খুবই পছন্দ করতেন। কেট শিশুসন্তান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মেরি-ই ডিকেন্স-এর সঙ্গে সব জায়গায় যেতেন এবং প্রায় সমস্ত সময়ের জন্য তাঁর সঙ্গী হয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও হৃদয়ের আনন্দ-বেদনার অংশ গ্রহণ করতেন। দিনে দিনে মেরি অত্যন্ত সুন্দরী হয়ে উঠছিলেন। তাঁর রূপ, তাঁর স্বভাব ও তাঁর সহানুভূতিতে মুগ্ধ হয়ে ডিকেন্স বোধহয় তাঁকে গভীর-ভাবে ভালোবেসে ফেলেন। খুব সম্ভব জীবনে তিনি আর কাউকে এত ভালোবাসেন নি। কিন্তু দুঃখের কথা, সেই তরুণ বয়সেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার অসুস্থতার ফলে হঠাৎ একদিন মেরি মারা যান। এই

সম্পূর্ণ অচিন্তিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় ডিকেন্স শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। গভীর আবেগে তিনি মেরির হাত থেকে তাঁর আংটিটি খুলে নিয়ে নিজের হাতে পরেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডিকেন্স সে-আংটিটি নিজের হাতে রেখেছিলেন। মেরির মৃত্যুর কয়েকদিন পর তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, "সে আর ইহজগতে নেই। ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করি আমি যেন তার সঙ্গে আবার মিলিত হতে পারি।" শুধু এই নয়, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে মেরির পাশে সমাহিত করার ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন। এইসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মেরি-কে ডিকেন্স সত্যিই গভীরভাবে ভালো-বেসেছিলেন অবশ্য এ বিষয়ে তিনি নিজে সচেতন ছিলেন কিনা সে-কথা আমাদের জানবার উপায় নেই।

ডিকেন্স যেবার সস্ত্রীক আমেরিকায় যান, সেবার তাঁর ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য কেট-এর আর এক বোন জর্জি হগার্থ-কে তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়েরা জর্জির অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ায় ডিকেন্স ও কেট ফিরে আসার পরও তাঁদের অনুরোধে জর্জি তাঁদের গৃহে থেকে যান এবং দীর্ঘকাল সেখানেই কাটান। জর্জিও সুন্দরী ছিলেন এবং চেহারার দিক থেকে মেরির সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিল ছিল। মিলটা এতই ছিল যে, তাঁকে দেখে ডিকেন্স-এর মাঝে মাঝে মনে হতো মেরিই বোধহয় আবার ফিরে এসেছেন। আকৃতির এই আশ্চর্য সাদৃশ্যের জন্যই বোধ-হয় ডিকেন্স জর্জিকেও ভালোবেসে ফেলেন। তবে জর্জি ডিকেন্সকে ভালোবেসেছিলেন কিনা তা একেবারেই বোঝা যায় না। ডিকেন্স-এর জীবনে তাঁর ভূমিকা বড়ই রহস্যময়।

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কেট-কে নিয়ে ডিকেন্স ছিলেন না। এরই জন্য বোধহয়, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সময় তিনি আবার এলিন টেরন্যান নামে এক অষ্টাদশী সুন্দরী অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন। জর্জি কেট-কে ঈর্ষা করতেন। তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এলিন-এর প্রতি তাঁকে ঈর্ষান্বিত হতে দেখা যায় নি। অন্তত বাইরে তিনি তা কোনো দিন প্রকাশ করেন নি। এইসব কারণেই ডিকেন্স-এর প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগ কিছুটা রহস্যাবৃত মনে হয়।

খুব সম্ভব এলিন টেরন্যান-এর প্রতি ডিকেন্স-এর অনুরাগের ফলেই শেষ পর্যন্ত কেট-এর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। অনেক বিরক্তিকর ঘটনার পর অবশেষে স্থির হয় যে, কেট ক্যামডেন্ টাউনে একটি পৃথক বাড়িতে বাস করবেন। তাঁকে বছরে ছশো পাউণ্ড দেওয়া হবে। কী জানি কেন, কেট এতে সম্মত হয়েছিলেন।

ডিকেন্স-এর সঙ্গে এলিন টেরন্যান-এর সম্বন্ধটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়িয়েছিল তা ভালোভাবে জানা যায় না। বলা বাহুল্য এসব ব্যাপার খুব গোপনই থাকে। তবে মম্ লিখেছেন, "এটা বিশ্বাস করা যায় যে, চার্লস্ ট্রিংহাম-এর ছদ্মনামে ডিকেন্স পেকহাম-এ একটি বাড়ি নিয়ে এলিন-কে সেখানে রেখেছিলেন। ডিকেন্স-এর মৃত্যু পর্যন্ত এলিন সেখানেই বাস করেন। ডিকেন্স-কন্যা কেটির মতে এলিন-এর গর্ভে নাকি ডিকেন্স-এর একটি সন্তানও হয়েছিল। তবে খুব সম্ভব সে-সন্তান শৈশবেই মারা যায়। তাই তার সম্বন্ধে পরে আর কিছুই শোনা যায় নি।"

যাই হোক, এলিন-এর জন্য ডিকেন্স অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, এলিন-ও ডিকেন্স-কে ভালোবাসেন নি। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে স্পষ্ট করেই সেকথা বলেছেন। তাঁর পক্ষে ডিকেন্স-কে ভালোবাসা বোধহয় সম্ভবও ছিল না। ডিকেন্স নিজেও সেটা পরে বুঝেছিলেন। এলিন-এর চেয়ে বয়সে তিনি পঁচিশ বছরেরও বেশী বড় ছিলেন। বয়সের কথাটা ডিকেন্স ভুলে ছিলেন। প্রেমের তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে মানুষ বারে বারে ভুল করে। ডিকেন্স-ও ভুল করেছিলেন। তাই এলিন-কে কাছে পেয়েও তিনি সুখী হতে পারেন নি। বরং গভীর দুঃখই পেয়েছেন। ডিকেন্স জীবনে যাকেই ভালোবেসেছেন, হয় সে ভালোবাসার যোগ্য নয়, হয় সে তাঁকে ভালোবাসে নি, নয় সে অকালে মারা গিয়েছে। তাই ভালোবেসে এবং ভালোবাসার পাত্রীর কাছে এসে তিনি দুঃখ আর যন্ত্রণাই শুধু ভোগ করেছেন। এইখানেই এই অসাধারণ জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিকের জীবনের ট্রাজিডি।

১৮৭০ সালের ৯ই জুন সামান্য কয়েকদিনের অসুস্থতার ফলে ডিকেন্স মারা যান। তখন তাঁর আটান্ন বছর বয়স। তাঁকে ওয়েস্ট-মিনস্টার অ্যাবি-তে সমাহিত করা হয়।

Gustave Flaubert 1821 A. D.-1880 A. D.

ফ্লোবের

সাহিত্য-ব্যবসায়ী ও সাহিত্য-সাধক এই দুই শ্রেণীতে যদি পৃথিবীর বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিকদের বিভক্ত করা যায় তা হলে শেষোক্ত শ্রেণী-ভুক্তদের একেবারে প্রথম দিকেই বোধহয় ফরাসীদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী গুস্তাভ ফ্লোবের-এর (Gustave Flaubert) নাম করতে হবে। ফ্লোবের-এর সাহিত্য-সাধনা সত্যিই বিস্ময়কর। ভগবদ্-সাধক যেমন ঈশ্বরোপাসনার জন্য দৈহিক ভোগসুখ ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকেন ফ্লোবের-ও তেমনি তাঁর কথাশিল্পের উৎকর্ষের জন্য অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন করে গেছেন। শুধু 'মাদাম বোভারি' লেখার জন্যই তিনি পঞ্চান্ন মাস অর্থাৎ প্রায় পাঁচ বছর অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন। পাঁচশো পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির দু-এক লাইন লিখতেও অনেক সময় তাঁর একাধিক দিন কেটে গেছে। তার মানে এই নয় যে তিনি সারা দিনে মাত্র এক-আধ লাইন লিখতেন। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লিখতেন তিনি অজস্র। কিন্তু যেমন লিখতেন তেমনি কাটতেন। লেখা আর কাটা সমানে চলতো। অনেক কাটাকুটির পর তাঁর মনোমত লেখা তিনি আবার নির্জনে গিয়ে চেঁচিয়ে পড়তেন। কানে একটু বেসুরো লাগলেই আবার কাটাকুটি শুরু হতো। এই ভাবে অদ্ভুত পরিশ্রম করে তিনি তাঁর রচনার এক অনন্য স্টাইল সৃষ্টি করেন। তাঁর সমকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন তা বিশেষ

ভাবে সমাদৃত হয়। বহু লেখক তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে আজকাল নাকি আধুনিক ফরাসী লেখকরা অনেকেই তাঁর স্টাইলে যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব আছে বলে মনে করেন। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। যুগে যুগে লেখক ও পাঠকদের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় এবং সাহিত্যেরও নতুন করে মূল্যায়ন হয়ে থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে ফ্লোবের-এর রচনা ও রচনারীতির আরো অনেক হয়তো দোষত্রুটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে যতদিন ফরাসী সাহিত্য বেঁচে থাকবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নিষ্ঠা সাধনার কথা অবশ্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে স্মৃত হবে।

১৮২১ সালে রুয়াঁ-তে (Rouen) গুস্তাভ ফ্লোবের-এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। শিক্ষিত, সুখী ও সচ্ছল এই পারিবারিক আবহাওয়াতে ফ্লোবের মানুষ। বাল্যকালে তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো ছিল। তবু, কী জানি কেন, ছেলেবয়স হতেই তাঁর এই জীবন মোটেই সুখের মনে হতো না। ছাত্রজীবনে বহু সহপাঠীর মধ্যে থেকেও অন্তরের গভীরতম সত্তায় তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। যৌবনে এই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি তাঁর আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। বন্ধুদের মাঝারি ধরনের মেধা ও বুদ্ধির জন্য তিনি মনে মনে তাদের অবজ্ঞা করতেন। তাদের অধিকাংশেরই স্থূল রুচি ও কৃত্রিম ভাবভঙ্গীর প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল অকৃত্রিম। ফ্লোবের আশৈশব ছিলেন দুঃখবাদী। সারাজীবন তিনি এক অদ্ভুত বিষণ্ণ বিরক্তির সঙ্গে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন।

অল্প বয়স হতেই ফ্লোবের মাঝে মাঝে লিখতেন। তবে একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্যই বোধহয় সাহিত্যকে তিনি জীবনের একমাত্র

অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন। সেটা ১৮৪৪ সালের কথা। একদিন রাত্রে তাঁর মায়ের এক সম্পত্তি পরিদর্শনান্তে তিনি ও তাঁর দাদা গাড়ি করে ফিরছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো কোথা থেকে এক বিশাল আগুনের ঢেউ এসে তাঁকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্ছিত হয়ে গাড়ির মধ্যে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হলে তিনি দেখলেন যে সারা শরীর তাঁর রক্তে ভিজে গেছে।

অবশ্য সুচিকিৎসার ফলে সে-যাত্রা তিনি বেঁচে যান। কিন্তু সেই হতে তাঁর এক দুরারোগ্য ফিটের ব্যাধির সূত্রপাত হয়। কখন যে ফিট হবে তার কোনোই ঠিক ছিল না। তার ফলে আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করে তিনি পারী হতে চলে আসতে বাধ্য হন এবং অতঃপর বাড়িতে থেকে শুধুমাত্র সাহিত্য-সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করবেন স্থির করেন।

বলা বাহুল্য, 'মাদাম বোভারি'-র জন্যই ফ্লোবের-এর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। অবশ্য ফ্রান্সে অনেকে তাঁর 'লেত্যুকাসিয়োঁ সাঁতিমাঁতাল'-কেই (L'Education Sentimentale) শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন। তবে বিদেশের পাঠকদের কাছে 'মাদাম বোভারি'-র নামই বেশী পরিচিত। 'মাদাম বোভারি'-র গল্পটি ফ্লোবের পান তাঁর কবিবন্ধু লুই বুইয়ে-র (Louis Bouilhet) কাছ থেকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই ফ্লোবের প্রথমে 'মাদাম বোভারি' লেখা শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স বছর তিরিশেক বোধহয় হবে। তারপর দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ সাধনা ও শ্রমের ফলে একদিন 'মাদাম বোভারি' সমাপ্ত হয়। আজকের দিনে শুনলে আশ্চর্য হতে হয় 'মাদাম বোভারি' প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক ও মুদ্রাকর নাকি অশ্লীলতা প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য কারাদণ্ড তাঁদের ভোগ

করতে হয় নি ; শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁরা নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠক কিন্তু উপন্যাসটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। দেখতে দেখতে অসংখ্য কপি বিক্রি হয়ে যায়। অবশ্য সমালোচকরা সে সময় মোটেই প্রশংসা করেন নি বইটির।

শুধু উপন্যাস নয়, গল্প-রচনাতেও ফ্লোবের অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর শেষ বয়সের লেখা 'য়ঁ্য ক্যর স্যাঁপল' (Un Coeur Simple) এক অপরূপ কথাশিল্পের নিদর্শন। সারা জীবনে ফ্লোবের খুব বেশী লিখতে পারেন নি। তার কারণ তিনি প্রত্যেকটি লেখার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি মনে করতেন কোনো কথা দু রকম ভাবে বলা চলে না। তা শুধু এক রকম ভাবেই বলা সম্ভব। এবং ভাব ও ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথভাবে সেই কথাটি প্রকাশের জন্য যে শব্দের একান্ত প্রয়োজন যতক্ষণ তিনি তা না-পেতেন ততক্ষণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে যেতেন। সাহিত্য তাঁর কাছে শুধুমাত্র অর্থযশদায়ী ব্যবসা ছিল না। সাহিত্য ছিল তাঁর প্রাণ। তিনি বলতেন সাধারণভাবে বেঁচে থাকাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অনন্য সাহিত্যসৃষ্টিই তাঁর জীবনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। এমন কি তাঁর জীবনে প্রেমকেও তিনি প্রথম স্থান দেন নি। সহজ প্রেমের তৃষ্ণাও দেখা যায় তাঁর গভীর শিল্পতৃষ্ণার কাছে পরাজিত। তাঁর অন্যতম প্রণয়পাত্রী মাদাম কলে-কে তিনি স্পষ্টই একদা জানিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনে প্রেমের স্থান দ্বিতীয়। তার স্থিতি নিঃসংশয়ে সাহিত্যের পরে।

অবশ্য পনেরো বছর বয়সেই ফ্লোবের গভীরভাবে প্রেমে পড়েন। সেটা বোধহয় ১৮৩৬ সালের কথা। ফ্লোবের-পরিবার গ্রীষ্মে সমুদ্র-তীরবর্তী এক গ্রামে অবসর যাপনের জন্য গিয়েছিলেন। যে-হোটেলে

তাঁরা উঠেছিলেন, জনৈক মোরিস স্লেজিঙ্গের-ও স্ত্রী ও শিশু-সন্তানসহ সেখানে ছিলেন। স্লেজিঙ্গের-এর স্ত্রী এলিসা-র বয়স তখন ছাব্বিশ এবং তিনি একটি সন্তানের জননী। ফ্লোবের এই বিবাহিতা সন্তানবতী যুবতী নারীকেই ভালোবেসে ফেলেন! তিনি এলিসা-র রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তরুণ প্রেমিকের অতিশয়োক্তির কথা বিবেচনা করলেও তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর একদিন স্লেজিঙ্গের-দম্পতির সঙ্গে ফ্লোবের জলযাত্রায় গিয়েছিলেন। ফ্লোবের ও এলিসা পাশাপাশি বসে ছিলেন। কথা বলতে বলতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের কাঁধ ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে, হাতে হাত ঠেকেছে। এক অদ্ভুত আনন্দের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ কিশোর গুস্তাভ অনুভব করেছেন তাঁর রক্তে, তাঁর সমস্ত শরীরে।

গ্রীষ্মশেষে ফ্লোবের-পরিবার আবার' রুয়াঁ-তে ফিরে এলেন এবং এক অনাস্বাদিতপূর্ব করুণমধুর যন্ত্রণার অনুভূতি নিয়ে গুস্তাভ-ও ফিরে এলেন স্কুলে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রইলো সেই সমুদ্রতীরে। দু বৎসর পর সুযোগ পেয়ে তিনি সেখানে যান। কিন্তু গিয়ে শুনলেন এলিসা-রা আর সেখানে থাকেন না। কোথায় যেন চলে গেছেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে এলিসা-র সঙ্গে ফ্লোবের-এর আবার দেখা হয়। সে-সময় তিনি তরুণ যুবক এবং গ্রীক্ দেবতার মত সুদর্শন পুরুষ। অনেক দিনের চেষ্টায় সাহস সংগ্রহ করে একদিন তিনি এলিসা-র কাছে প্রেম নিবেদনও করেছিলেন। ফ্লোবের-এর অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে এবং নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে এলিসা নাকি তাঁর কক্ষে আসতেও সম্মত হয়েছিলেন। ফ্লোবের উত্তপ্ত উৎকণ্ঠায় তাঁর প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু কেন জানি, শেষ পর্যন্ত এলিসা আর তাঁর কক্ষে

আসেন নি। অনেকের মতে ফ্লোবের একমাত্র যে নারীকে সত্যিকার ভালোবেসেছিলেন তাঁর দেহ ও মন কোনোটাই তিনি পান নি।

এরপর মহিলা-কবি লুইজ্ কলে-এর (Louise Colet) কথা। অবশ্য ইতিপূর্বে মারসেয়-তে এ্যলালিয় ফুকো (Eulalie Foucaud) নামে জনৈকা বিবাহিতা রমণীর সঙ্গে নাকি ফ্লোবের এক রাত্রি একত্রে যাপন করেন। সেই রাত্রের মধুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি 'নভাব্র' (Novembre) নামে একটি ছোট উপন্যাসও লেখেন। কিন্তু মাদাম কলে-এর সঙ্গে অনেকদিন তাঁর একটা সম্পর্ক ছিল এবং ফলে তাঁকে ভালোও বেসেছিলেন।

মহিলা-কবি লুইজ্ কলে জনৈক সঙ্গীতের অধ্যাপক ইপলিং কলে-র স্ত্রী। পারী-তে তাঁর একটি সালঁ (Salon) ছিল। সেখানে প্রতিদিন বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সমাগম হতো। সেই গুণীজনসভায় তিনি 'দি মিউজ'রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে ভালো কবিতা লিখতে পারতেন তা নয়; তবে তাঁর রূপ ছিল এবং তিনি প্রসাধন-চর্চাতেও নিপুণ ছিলেন। একজন মহিলার সাধারণ কবিখ্যাতির জন্য এই বোধহয় যথেষ্ট। বিশেষ প্রয়োজনে পারী-তে গিয়ে ফ্লোবের তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন ফ্লোবের-এর বয়স পঁচিশ এবং কলে-এর বয়স তিনি নিজে বলতেন তিরিশ। কিন্তু ও বয়সে সাধারণ মহিলারা কবেই বা ঠিকঠিক বয়স বলে থাকেন! প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স আরো কিছু বেশী ছিল। যাই হোক, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফ্লোবের তাঁর নজরে পড়েন এবং তাঁর প্রেমিক হয়ে ওঠেন। অবশ্য তাঁর অন্যান্য প্রেমিক ও ভক্তদের হটিয়ে দিয়ে নয়,—তাঁদের অন্যতম হয়ে।

বেশীদিন পারী-তে থাকা ফ্লোবের-এর পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। তিনদিন পর অশ্রুমুখী মিউজ-কে ছেড়ে পারী হতে তিনি নিজের বাড়ি ক্রোয়াশ্যে-তে (Croisset) ফিরে আসতে বাধ্য হন। সুতরাং এর পর হতে তাঁদের মধ্যে নিয়মিত প্রেমপত্রের আদান-প্রদান শুরু হয়। কিন্তু মাদাম কলে-র বোধহয় শুধুমাত্র কাগুজে প্রেমে পরিতৃপ্তি ছিল না। তাই তিনি বার বার ফ্লোবের-কে পারী-তে এসে বসবাস করার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু ফ্লোবের-এর পক্ষে পারী-তে বাস করা তখন প্রায় অসম্ভব। যদিও তখন আর তাঁর ফিটের উপসর্গ দেখা দিত না, তবু হঠাৎ আবার কখন হয় এই আশঙ্কায় তাঁর মা তাঁকে বেশী দিনের জন্য কোথাও একা ছেড়ে দিতে চাইতেন না। সুতরাং মাঝে মাঝে পারী-তে আসা ছাড়া স্থায়িভাবে সেখানে বসবাস করা ফ্লোবের-এর পক্ষে তখন সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত তাই কলে-এর সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষিতই থেকে যায়। এবং তার ফলে বছর ছয়েকের মধ্যেই তাঁদের এই প্রণয়লীলার প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি হয়।

অবশ্য বেশ কিছুকাল পর মাদাম কলে-এর সঙ্গে ফ্লোবের-এর আবার দেখা হয়। এই সাক্ষাতের ফলে পুরাতন প্রেম পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। আবার তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়। প্রথম থেকেই ফ্লোবের তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও তাঁর জীবনের সমস্ত কথাই সরলভাবে লিখে জানাতেন। এমন কি তিনি যে বহুবার গণিকালয়ে গিয়েছেন সে-কথা জানাতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি কলে-এর প্রেমাবেগ ব্যাহত হয় নি, উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধিই পেয়েছে। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-সময় কলে-এর স্বামীর

মৃত্যু হয়েছে। তিনি মনে মনে ফ্লোবের-কে বিয়ে করবেন স্থির করেন। এবং অচিরেই সেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এ কথাও কী জানি কেন অনেক বন্ধুর কাছে বলে বেড়াতে থাকেন। ফ্লোবের আজীবন অবিবাহিত থাকবেন স্থির করেছিলেন। সুতরাং এ সংবাদ শুনে তিনি রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। অনেক ঝগড়া-ঝাটির পর তিনি স্পষ্ট লিখে জানান যে কলে-এর মুখ আর তিনি দেখতে চান না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাদাম কলে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ক্রোয়াশ্যে-তে গিয়ে উপস্থিত হন। ফ্লোবের তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে দূর করে দেন যে তাঁর মা পর্যন্ত তাতে দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করেন।

যাই হোক, এর ফলে চিরদিনের জন্য এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হয় এবং শোনা যায় প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির জন্য অতঃপর মাদাম কলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লেখেন যাতে ফ্লোবের-এর চরিত্র অত্যন্ত কুশ্রী ভাবে অঙ্কিত করা হয়।

ফ্লোবের কিন্তু মোটেই উদাসীন বা কঠোর-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন না। আসলে মনে হয় এলিসা ছাড়া আর কোনো নারীকেই তিনি সত্যিকার ভালোবাসেন নি এবং সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত কলে-এর সঙ্গে ঐরকম ব্যবহার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। না হলে স্নেহ প্রেম তাঁর কাছে শুধুমাত্র কথার কথা ছিল না। শুধু তাই নয়, তাঁর হৃদয়ও অত্যন্তই কোমল ছিল। তাঁর জীবনের ছোটবড় অনেক ঘটনা পড়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য তিনি ত্যাগ স্বীকারও করেছেন যথেষ্ট। তাঁর শেষ জীবনের একটি ঘটনার কথা বলি।

ফ্লোবের তাঁর ভাগ্নী কারলিন-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর কারলিন-এর স্বামী ভীষণ আর্থিক

দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ফ্লোবের তাঁর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। এর ফলে ফ্লোবের-এর নিজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মানসিক অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় তাঁর আবার ফিটের রোগ দেখা দেয়। তাঁর মেজাজও অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে ওঠে। অন্য কোনো উপায় না দেখে তাঁর বন্ধুরা তাঁর জন্য বাৎসরিক তিন হাজার ফ্রাঁ-র একটি কর্মহীন চাকরির ব্যবস্থা করেন। ফ্লোবের স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবতে পারেন নি যে এই রকম পদ তাঁকে একদা গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত অপমান বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই চাকরি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বেশীদিন তাঁকে এই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি। ১৮৮০ সালের ৮ই মে সকাল গোটা এগারোর সময় পরিচারিকা তাঁর ঘরে খাবার দিতে এসে দেখতে পান যে ফ্লোবের ডিভান-এর ওপর শুয়ে বিড়বিড় করে অসংলগ্নভাবে কী যেন বলছেন। পরিচারিকা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনেন। কিন্তু ডাক্তার কিছুই করতে পারে নি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্যুস্তাভ ফ্লোবের-এর মৃত্যু হয়।

ফ্লোবের-এর প্রেমজীবন সম্পর্কে সামান্য কিছু আভাস দিতে উদ্যত হয়ে অবশেষে আর একটি কথা লেখার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। পরিণত বয়সে ফ্লোবের একদা তেয়ফিল গোতিয়ে, ত্যেন প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে এক অদ্ভুত উক্তি করেছিলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে তিনি জীবনে কখনো নারীসম্ভোগ করেন নি।—এ উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে এ কথা বলতেই হবে যে ফ্লোবের-এর জীবনের এই দিকটা সত্যিই অসাধারণ এবং কিছুটা রহস্যময়ও।

Lev Tolstoi 1828 A. D.-1910 A. D.

টলস্টয়

ইংল্যাণ্ড যদি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য গর্ব করে তা হলে রাশিয়াও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জন্য গর্ববোধ করতে পারে। টলস্টয় নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস', 'আনা কারেনিনা', 'রেসারেক্শন' প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে বিস্ময়কর অবদান। • এর মধ্যে 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস' সত্যিই অতুলনীয়। এটিকে সার্থকভাবেই 'এপিক উপন্যাস' বলা চলে। এক বিরাট ক্যানভাসের ওপর আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি যে-সব চিত্র অঙ্কিত করেছেন তা দেখে শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়. বিস্মিতও হতে হয়।

এই বৃহৎ ও মহৎ উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রায় শ পাঁচেক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং আশ্চর্য, তাদের প্রায় সকলকেই রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ বলে বোধহয়। কয়েকটি প্রতিনিধিমূলক নারী ও পুরুষ চরিত্রকে বিদেশী আমরাও যেন একান্ত চেনা ও জানা বলে অনুভব করতে পারি। বলা বাহুল্য, এই সাফল্য সাধারণ শক্তিতে সম্ভব নয়। সত্যিই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তে হয়। টলস্টয়-এর সমসাময়িক জনৈক বিখ্যাত রুশ সমালোচক 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কয়েকটি কথায় চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস' হচ্ছে মানবজীবনেরই পূর্ণাঙ্গ ছবি, তৎকালীন সমগ্র রাশিয়ার সম্পূর্ণ চিত্র এবং জনসাধারণের

ইতিহাস, সংগ্রাম ও সব কিছুর আলেখ্য যার ভিতর দিয়ে জনগণ তাঁদের সুখ, দুঃখ, বেদনা ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারেন।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কথাশিল্পী টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিনই বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকবেন। এবং এ-ও বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই কথাসাহিত্যিকের আশ্চর্য পরিচয় ছাড়াও তাঁর আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে। তা হচ্ছে ঋষি ও দার্শনিক টলস্টয়ের পরিচয়। অবশ্য অনেকের মতে সাহিত্যস্রষ্টা টলস্টয়-এর তুলনায় ঋষি টলস্টয় অনেক নিষ্প্রভ। কিন্তু তা হলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে একদা ঋষি টলস্টয়-এর চিন্তাধারায় পৃথিবীর বহু মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন। আমাদের গান্ধীজীও তাঁদের মধ্যে একজন। ঋষি টলস্টয় খ্রীস্ট ও বুদ্ধের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। খ্রীস্ট ও বুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তিনি আবেগে গদগদ হয়ে উঠতেন। তিনি অহিংসারও পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। একবার গোর্কি তাঁকে বলেন, 'যে সব সক্রিয় লোক জীবনের অন্যায়কে যে-কোনো উপায়ে, এমন কি হিংসার দ্বারাও প্রতিরোধ করতে চান, তাঁদের আমি পছন্দ করি।'

শুনে টলস্টয় গোর্কির হাতটা সস্নেহে টেনে নিয়ে শুধু বলেন, 'কিন্তু হিংসাটাই যে সবচেয়ে বড় অন্যায়। তুমি এই স্বত-বিরোধিতার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাবে?'

বস্তুত টলস্টয় খ্রীস্ট ও বুদ্ধের অহিংসামন্ত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তবে তাঁদের একান্ত অনুরাগী ভক্ত হলেও তাঁদের জীবনের অলৌকিক সব গালগল্প বিশ্বাস করতেন না। তিনি সব

কিছুই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির দ্বারা পরিচ্ছন্ন করে তবে গ্রহণ করতেন। তাঁর চিন্তায় ও কর্মে সততা ও আন্তরিকতাও ছিল অপূর্ব। তিনি যা চিন্তা করতেন বোধহয় শুধুমাত্র তা-ই বলতেন এবং প্রাণপণে তা করার চেষ্টা করতেন। মুখে একরকম বলে কাজে আর একরকম করা তাঁর প্রকৃতিতে ছিল না। অন্তত তা করতে তিনি বিশেষ যন্ত্রণাবোধ করতেন। এজন্য তিনি জীবনে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। একে একে তিনি সর্বপ্রকার দৈহিক ভোগসুখ ত্যাগ করেছেন, শীতের দেশে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তাঁর চিরদিনের মদ্যপানের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন এবং এমন কি অনেক চেষ্টায় অবশেষে তাঁর সামান্য ধূমপানের অভ্যাসও ত্যাগ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি যে মারা গেলেন তাও একরকম তাঁর অন্তরের আদেশ রক্ষা করার জন্যই বলা চলে। সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে শুধু স্রষ্টা টলস্টয়ই নয়, ঋষি টলস্টয়, মানুষ টলস্টয়, প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ, অসামান্য এবং সমকালে তুলনারহিত।

এই আশ্চর্য মানুষটি ১৮২৮ সালে রাশিয়ায় তাঁর মায়ের পৈত্রিক বাসস্থান ইয়াস্নায়া পোলানা-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাউন্ট নিকোলাস্ টলস্টয় ও মাতার নাম ম্যারিয়া ভোল্‌কোন্‌স্কাইয়া। উভয়দিক হতেই তিনি বিশুদ্ধ নীল রক্তের অধিকারী। কাউন্ট লিও নিকোলাইয়েভিচ্ টলস্টয় তাঁর সম্পূর্ণ নাম। তিনি তাঁর বাপমায়ের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। শৈশবেই তিনি তাঁর বাপ-মাকে হারান। প্রথমে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়; পরে কাজান ইউনিভার্সিটিতে,—সবশেষে পিটার্সবার্গে। ছাত্র হিসাবে

তিনি কোনো কালেই ভালো ছেলে ছিলেন না এবং কোনো বিষয়েই ডিগ্রি গ্রহণ করেন নি। তবে অল্প বয়স হতেই তিনি বোধহয় তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কারণ স্কুল-কলেজে তিনি সব সময়ই তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন এবং সাধারণ সহপাঠীদের সঙ্গে অল্পই মিশতেন। সেজন্য তাঁর অনেক সহপাঠীই তাঁকে বিশেষ অপছন্দ করতেন।

অল্প বয়সেই টলস্টয় সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর ভাই নিকোলাই ইতিপূর্বেই সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেছিলেন। সেটা ১৮৫১ সালের কথা। টলস্টয়-এর বয়স তখন বছর তেইশেক হবে। কিছুদিনের ছুটিতে নিকোলাই ককেসাস থেকে মস্কো-তে এসেছিলেন। ছুটিশেষে তাঁর ফেরার সময় হলে টলস্টয় তাঁর সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। এর কয়েক মাস পর তিনি নিজেই সৈন্য-বিভাগে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে সহকর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা দর্শনে প্রথমে তিনি নাকি খুবই মর্মাহত হন। তবে পরে তিনি এতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর নিজের জীবনও অনেকটা এঁদের মতই কাটতে থাকে।

এই সময়কার ঘটনা থেকে টলস্টয়-এর জীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তা মোটে শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। সঙ্গদোষের জন্যই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, তিনি নিজে খুবই মদ্যপান করতেন, জুয়ায় অসম্ভব ঝুঁকি নিতেন এবং অবৈধ নারীসম্ভোগেও নাকি অক্লান্ত ছিলেন। তবে এসব ব্যাপারে তিনি সত্যি সত্যি সুখ পেতেন না। তাঁর ডায়েরী পড়লে জানা যায় একটি রাত্রি মদ্যপান, জুয়া ও স্ত্রীলোক

নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে কাটানোর পর তিনি ভয়ানক মানসিক অশান্তি ভোগ করতেন এবং অনুতাপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতেন। তবে আশ্চর্য, পরে সুযোগ এলে আবার তিনি ঠিক তা-ই নাকি করতেন।

সৈন্য-বাহিনীতে টলস্টয় অবশ্য যথেষ্ট দক্ষতা ও বীরত্বেরও পরিচয় দেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বিশেষ সাহস ও বীরত্বের জন্য তাঁকে লেফ্‌টেনান্ট পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু সৈনিকজীবন ও সৈনিকদের তাঁর একেবারেই ভালো লাগতো না। এই সঙ্গ ও জীবনধারায় তিনি অন্তরে সত্যিই যন্ত্রণা বোধ করতেন। সুতরাং ১৮৫৬ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি সৈন্য-বিভাগের চাকরি পরিত্যাগ করে পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

সৈন্য-বাহিনীতে থাকাকালীনই টলস্টয় কতকগুলি নকশা ও ছোট-গল্প লেখেন এবং তাঁর বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি প্রায় গল্পের মত করে রচনা করেন। এইগুলি একটি পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করে ফেলেন। এবং সৈন্য-বাহিনী হতে ফিরে আসার পূর্বেই তাঁর 'চাইল্ড্‌হুড্‌' ও 'টেল্‌স ফ্রম্‌ সীবাস্‌টোপোল' প্রকাশিত হয়ে যায়। তার ফলে পিটার্সবার্গে পৌঁছনোমাত্র একজন শক্তিমান তরুণ লেখক হিসাবে তিনি সাদরে গৃহীত হন।

এই সময় রাশিয়াতে সার্ফ্‌ বা ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়ার এক উদার মনোভাব অনেকের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। টলস্টয়-ও তাঁর জমিদারির চাষীদের মুক্তিদানের এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু চাষীরা সন্দেহবশত এ সময় তা গ্রহণ করে না। অতঃপর টলস্টয় তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা

করেন। তিনি নিজেই সেখানে পড়াতেন এবং গল্পে-গানে সারাদিন তাদের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। স্কুলের বিশেষত্ব ছিল এই যে সেখানে কোনো রকম অনুশাসন বা শাসনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রায় বছর দুয়েক এই স্কুলটি তিনি চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার পর অধ্যবসায়ের অভাবের জন্যই হোক, বা তাঁর কাজ প্রায় নিষ্ফল হচ্ছে দেখেই হোক, অবশেষে তিনি তা বন্ধ করে দেন।

এই সময় টলস্টয়-এর জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তাঁর ভূমিদাসদের একজনের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয় এবং তার ফলে নাকি একটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। ব্যাপারটাকে একেবারে ধনী জমিদারের চিরাচরিত ব্যভিচারের কাহিনী বলে মনে করলে ভুল করা হবে। কারণ টলস্টয় সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে স্পষ্টই লিখেছেন,—'এর পূর্বে আমি আর কখনো এ রকম ভালোবাসি নি।"

ভালোবেসেছিলেন টলস্টয় ঠিকই। তবে মনে হয় সে-ভালোবাসা তেমন গভীর ছিল না। কারণ টলস্টয় তাঁর এই অবৈধ সন্তানকে নিজের পুত্রের মত মানুষ করেন নি। পরবর্তীকালে সে নাকি টলস্টয়-এর পরিবারে কোচোয়ানের কাজ করে জীবন কাটিয়েছে। কোনো নারীকে গভীরভাবে ভালোবাসলে তার গর্ভজাত নিজের সন্তানের প্রতি কোনো সহৃদয় বিবেকবান ব্যক্তি কি এ রকম ব্যবহার করতে পারেন? বিশেষত টলস্টয়-এর মত মানুষের পক্ষে তো একেবারে অসম্ভবই মনে হয়। সুতরাং এ থেকে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে তিনি সত্যি সত্যি ভালোবাসলেও সে-ভালোবাসা তেমন গভীর ছিল না। অবশ্য গভীরভাবে ভালো না বাসলেও নিজের অবৈধ সন্তানের প্রতি এ রকম

দায়িত্বহীন ঔদাসীন আচরণ এমনিতেও বেশ অশোভন। টুর্গেনিভ, বায়রন এবং আরো অনেকেরই অবৈধ সন্তান ছিল। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সেই অবৈধ সন্তানদের নিজেদের বৈধ পুত্রকন্যাদের মতই শিক্ষিত ও মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে-টলস্টয় মানবপ্রেমিকরূপে বিশ্ববন্দিত, যিনি নিঃসম্পর্ক নগণ্য ভূমিদাসদের শিশুদের শিক্ষিত করার জন্যও বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন, তিনি যে কেন তাঁর নিজের অবৈধ সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিকমত করেন নি তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। তাঁর মত উদার, বিবেকবান ও কুসংস্কারবর্জিত মানুষের কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার সত্যিই অপ্রত্যাশিত। বেশ একটু খটকা লাগে আমাদের। সুতরাং, এটা কারো নিছক অপপ্রচার না-হলে, এই ঘটনায় তাঁর চরিত্রের একটা দিকের মানবিক দুর্বলতা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু যাক এ সব কথা। পূর্বের কথায় ফিরে আসি। নানারকম মানবকল্যাণকর কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দিনে দিনে টলস্টয় ক্লান্ত, হতাশ ও অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। জীবনে কোনো সুখশান্তির সন্ধানই তিনি পাচ্ছিলেন না। অবশ্য তখনো তাঁর বিবাহিত জীবনের দিকটি অদেখা ছিল। তিনি অতঃপর ঐ দিকটি দেখবেন স্থির করলেন।

একের পর এক কয়েকটি তরুণীকে খারিজ করে অবশেষে তিনি মস্কোর জনৈক চিকিৎসকের কন্যা সোনিয়া বার্ক্-কে*

* টলস্টয় সম্পর্কে অনেক রচনায় আমি দেখেছি টলস্টয়-পত্নীর নাম, 'সোফিয়া (Sophia) আন্দ্রিয়েভনা'। কিন্তু সমারসেট ম'ম্ লিখেছেন 'সোনিয়া' (Sonya)। আমি প্রধানত ম'ম্-এর লেখার উপর নির্ভর করেই এই প্রবন্ধ লিখেছি। সুতরাং আমি 'সোনিয়া'-ই রেখে দিলাম। বিশেষত স্ত্রীকে লেখা টলস্টয়-এর চিঠিতেও আমি 'সোনিয়া' নামই দেখেছি। হয়তো এটি তাঁর ডাক-নাম ছিল।

মনোনীত করলেন। সোনিয়া দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। তাঁর গলার স্বরও অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল। টলস্টয় তাঁকে ভালোবেসে ফেললেন। তিনিও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসলেন। অল্পবয়স হতেই টলস্টয়-এর ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। ডায়েরিতে তিনি তাঁর আশা, আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, প্রার্থনা, আত্মতিরস্কার, দোষত্রুটি এমনকি তাঁর ব্যভিচারের কথা পর্যন্তও অকপটভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। বিবাহের পূর্বে নিজের ভাবী পত্নীর কাছ হতে কোনো কিছুই গোপন রাখবেন না এই সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর ডায়েরি সোনিয়া-কে পড়তে দেন। বলা বাহুল্য, সোনিয়া তাঁর ডায়েরি পড়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সমস্ত রাত্রি নাকি কেঁদে কাটান। কিন্তু পরিশেষে টলস্টয়-এর সব কিছু অপরাধই তিনি ক্ষমা করেন। সুতরাং তাঁদের বিবাহে আর কোনো বাধা থাকে না। অতঃপর ১৮৬২ সালে তাঁদের বিবাহ হয়। তখন টলস্টয়-এর বয়স চৌত্রিশ ও সোনিয়া-র বয়স আঠারো। এই বিবাহের ফলে প্রথমে টলস্টয় নাকি নিজেকে খুবই সুখী মনে করেন। বিবাহের পর তাঁর ডায়েরিতে তিনি অনেকটা এই রকম কথা লেখেন,—পরিপূর্ণ সুখ যে কাকে বলে এই প্রথম আমি তা জানতে পারলাম।—সত্যিই বাহ্যত কিছুকাল অন্তত তাঁদের এই বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। তবে পরে তাঁদের স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে পড়ে; এত তিক্ত যে অবশেষে টলস্টয়-এর জীবন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত, এই রকম অনুমান করা হয় যে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি যে গৃহত্যাগ করেন তা তাঁর স্ত্রী এই সোনিয়া টলস্টয়-এর ভয়ে বা তাঁর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েই,—অন্য কারণে নয়।

যাই হোক, বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটায় যে টলস্টয় সুখী হয়েছিলেন তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য গোর্কির মতে টলস্টয় কোনো দিনই সুখী ছিলেন না। তিনি বলেছেন,—'কী জ্ঞানের গ্রন্থব্যূহে, কী অশ্বপৃষ্ঠে, কী নারীর বাহুবল্লরীতে কোথাও টলস্টয় পার্থিব স্বর্গের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করেন নি।'—কারণটা তিনি বলেছেন টলস্টয়-এর অসাধারণ বুদ্ধি। সত্যিই, আমাদেরও মনে হয়, তিনি যেমন বিস্ময়কর তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে সুখী হওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল। তবে তাঁর মনের এই অশান্তি, অসুখ ও অতৃপ্তিই বোধহয় পরিণামে তাঁকে ঋষিতে পরিণত করেছিল। কিন্তু ঋষি টলস্টয়ও কি শেষ পর্যন্ত সুখী হতে পেরেছিলেন?—যতদূর জানা যায় ও বোঝা যায়, তাতে মনে হয়,—না।

অনেকের মতে প্রায় বছর পঞ্চাশেক বয়স পর্যন্ত টলস্টয় যে-ভাবে জীবন কাটিয়েছেন তা আর পাঁচজন শিক্ষিত উদারপন্থী রুশ জমিদারের জীবন থেকে খুব একটা উন্নত বা পৃথক কিছু নয়। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল শুধু এই যে এই সময়ের মধ্যেই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ওঅর অ্যাণ্ড্ পীস' ও 'আনা কারেনিনা' রচনা করেছিলেন এবং বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তবে, পূর্বেই বলা হয়েছে, এতেও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। এই বয়সের মধ্যে সাধারণ মানুষের যা কাম্য—স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুন্দরী স্ত্রী, যশ, প্রতিপত্তি প্রায় সমস্তই তিনি পেয়েছিলেন। তবু তিনি তাঁর মনের গভীরতম প্রদেশে সুখী হতে পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর একদিন সমস্ত জীবনটাই কেমন অর্থহীন বলে বোধ হতে থাকে।—কেন এই সব? কেন এই বাঁচা? কী হবে এই সব দিয়ে? এর পরিণামেই বা কী? এই কি বাঁচা?

এই কি জীবন? জীবনের প্রকৃত অর্থ কী? জীবনের অর্থই যদি না-জানা গেল তা হলে এই অর্থহীনভাবে বেঁচে থেকে লাভ?—এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন দিবারাত্র তাঁর মনের মধ্যে মাথা তুলে তাঁর অন্তরের সমস্ত শান্তি তছনছ করে দিতে শুরু করলো।

বস্তুত সব চিন্তাশীল মানুষের জীবনেই বোধহয় এ দুঃখ ও অশান্তি প্রায় অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন,—'The abiding cause of all misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance.' —টলস্টয়ও হয়তো এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং জীবনের একটা অর্থ খুঁজে বার করার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

কিন্তু জীবনের প্রকৃত অর্থ কি কেউ কোনো দিন আবিষ্কার করতে পেরেছে? মনে তো হয় না। চিন্তাশীল মানুষ শেষ পর্যন্ত ওটা নিজেদেরই জ্ঞানবুদ্ধিমত আরোপ করে এসেছেন। টলস্টয়ও বোধহয় শেষ পর্যন্ত তাই করেছিলেন।

যাই হোক, এই সময়ের পর হতে ধীরে ধীরে টলস্টয়-এর মনের বিশেষ পরিবর্তন হতে থাকে। নানা যুক্তি দ্বারা আবার তিনি ভগবানে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন। এবং বারবার সংশয় দেখা দিলেও পরলোকে আস্থা অটুট করে তোলেন। নিজের চিন্তাধারা অনুসরণ করে একে একে তিনি সমস্ত দৈহিক ভোগসুখ ত্যাগ করতে থাকেন। তাঁর মনে হয়, তাঁরও কায়িক শ্রমের দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করা উচিত। এর ফলে একজন সাধারণ চাষীর মতই জীবন কাটাতে শুরু করেন তিনি। জুতো তৈরি করা, ঘর তৈরি করা প্রভৃতি কাজের দ্বারাও তিনি

অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে থাকেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সব কারণে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ মত-বিরোধ দেখা দিতে থাকে। কাউন্টেস-এর কাছে এ সব নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। টলস্টয়-এর মত একজন সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ অসাধারণ প্রতিভাবান কথা-শিল্পী যে চাষ করে, জুতো তৈরি করে সময় ও মস্তিষ্কের অপব্যবহার করবেন এটা তাঁর কাছে অসহ্য। তবু প্রথম-প্রথম টলস্টয়-এর এই সব কাজ তিনি যতদূর সম্ভব সহ্য করেই গেছেন। কিন্তু টলস্টয় যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা অন্যায়,—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিতে উদ্যত হলেন তখন আর তাঁর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হলো না। ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করবেন বলে টলস্টয়কে ভয় দেখালেন। ফলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহ শুরু হয়ে গেল। অতঃপর টলস্টয় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীকে দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু স্ত্রী তা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। শেষ পর্যন্ত টলস্টয় তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে তা সমান ভাগ করে দিয়ে দিলেন।

যাই হোক, এমনি অসংখ্য কারণে দিনে দিনে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়ে উঠতে লাগলো। এবং এরপর একটি অদ্ভুত ঘটনা এই সম্পর্ককে একেবারে কুশ্রী করে তুললো। ঘটনাটি বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু ম'ম্ তাঁর লেখায় স্পষ্ট ভাষাতেই এটির উল্লেখ করেছেন।

টলস্টয়-এর বয়স তখন আটষট্টি এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। এই সময় সোনিয়া টলস্টয় নাকি ট্যানায়েভ্ নামে তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এক ব্যক্তির প্রেমে পড়েন। কিছুদিন তিনি এতে একেবারে মত্ত ও মগ্ন হয়ে যান। টলস্টয় স্বাভাবিক কারণেই

এ ব্যাপারে বিশেষ লজ্জিত, মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হন। তিনি অবশেষে স্ত্রীকে স্পষ্ট লিখে জানান যে তাঁর পক্ষে এটা আর শান্তভাবে সহ্য করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তাঁরা একসঙ্গে বাস করলে তাঁর জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং অচিরে তা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সোনিয়া যদি এ ভাবে চালিয়ে যান তা হলে তাঁদের বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়া সহজ ছিল না। নিন্দা, কুৎসা ও কলঙ্ক প্রচারের ভয় তো ছিলই, তাছাড়া আরো অনেক বাধা ছিল।

তবে বিধাতাকে ধন্যবাদ, এই অসমবয়সীর প্রেম বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বলা বাহুল্য পঞ্চাশোত্তীর্ণা মহিলার অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে প্রণয় দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প। একটু বিলম্বে হলেও কাউণ্টেস তা অবশেষে বুঝলেন। ট্যানায়েভ্ যে তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে না এবং দিনে দিনে তাঁর সঙ্গ তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে এটা তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না। বলা নিষ্প্রয়োজন এতে প্রথমে তিনি খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। তবে এর ফলে বিশ্রী ঘটনার পরিসমাপ্তিও ঘটলো।

কিন্তু এই অপ্রীতিকর ঘটনা শেষ হওয়া সত্ত্বেও স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক আর উন্নত বা স্বাভাবিক হলো না। নানা কারণে দিনে দিনে তা আরো খারাপ হতে থাকলো। টলস্টয় তাঁর সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের স্বত্বাধিকার জনসাধারণের হাতে দিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য চেরৎকোভ্ এবার তা আইনসংগত করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কাউণ্টেস-এর কানে এ কথা যাওয়ায়

তিনি একেবারে খেপে গেলেন। কাউন্টেস-এর সঙ্গে চেরৎকোভ্-এর মনোমালিন্য দীর্ঘদিন হতেই ধূমায়িত ছিল। এই ব্যাপারে এবং আরো একটি বিশেষ কারণে এবার তা একেবারে প্রকাশ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। টলস্টয়-এর শেষ জীবনের সমস্ত ডায়েরি চেরৎকোভ্-এর হাতে ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে টলস্টয় তাঁর ডায়েরিতে নিজের সমস্ত কথা সম্পূর্ণ অকপটে লিখে রাখতেন। সুতরাং এগুলি কোনো দিন প্রকাশিত হলে কাউন্টেসের সঙ্গে টলস্টয়-এর কুশ্রী মনোমালিন্যের কথাও প্রকাশিত হয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় কাউন্টেস বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সেজন্য একদা তিনি দাবি জানিয়ে সেগুলি চেরৎকোভ্-এর কাছে চেয়ে পাঠান। কিন্তু চেরৎকোভ্ তা দিতে সোজা অস্বীকার করেন। ক্রুদ্ধ কাউন্টেস উপায়ান্তর না দেখে অতঃপর টলস্টয়-কে ভয় দেখান যে ওগুলি চেরৎকোভ্-এর কাছ থেকে নিয়ে এসে তাঁকে না-দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। লজ্জিত, ব্যথিত, বিপর্যস্ত টলস্টয় এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে কী করবেন প্রথমে স্থির করতে পারেন না। অবশেষে তিনি সেগুলি চেরৎকোভ্-এর কাছ হতে নিয়ে এসে এক ব্যাঙ্কে রেখে দেন। এতে আবার চেরৎকোভ্ অত্যন্ত চটে যান। তিনি টলস্টয়-এর দুর্বলতার জন্য তাঁকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করে এক চিঠি দেন। এইভাবে দু দিক থেকেই আক্রান্ত ও অভিযুক্ত হয়ে টলস্টয়-এর জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, —'এরা দু দিক থেকেই আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এক এক সময় আমার ইচ্ছে হয় যে এদের সবার থেকে দূরে কোথাও আমি পালিয়ে যাই।'

সত্যিই এইসব নানা কারণে দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা টলস্টয়-এর মনে দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এবং একটি আকস্মিক ঘটনাতেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত সেটা বাস্তবেও ঘটে যায়। টলস্টয়-এর বয়স তখন বিরাশি বছর। বলা বাহুল্য তিনি বৃদ্ধ এবং রুগ্নও।

সব রকম বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ইতিপূর্বেই টলস্টয় একটি উইল করে তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব জনসাধারণকে দান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের উইলে আইনগত নানা রকম গোলোযোগ দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় চৈরৎকোভ্ আবার টলস্টয়-কে দিয়ে গোপনে আরো দুটি উইল করিয়ে নেন। শেষ উইলে নাকি টলস্টয়-এর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপির ওপর অধিকার চেরৎকোভ্-কে দেওয়া হয়।

এই গোপন উইলের কথা কাউন্টেস জানতে পারলে কী ভীষণ কেলেঙ্কারি কাণ্ড যে করবেন তা ভেবে টলস্টয় বোধহয় সবসময়ই কিছুটা শঙ্কিত থাকতেন। একদিন রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন এমন সময় শুনলেন কাউন্টেস তাঁর পড়ার ঘরে ঢুকে কাগজপত্র সব নাড়াচাড়া করছেন। গভীররাত্রে সোনিয়া টলস্টয় কী জন্য সেখানে ঢুকেছিলেন কে জানে এবং টলস্টয় ঠিক কী ভেবেছিলেন বলা যায় না। তবে কাউন্টেস তাঁর গোপন উইলের কথা হয়তো জানতে পেরেছেন এবং সেইটেই খুঁজছেন এ রকম তাঁর মনে হওয়া অসম্ভব ছিল না। যাই হোক, কাউন্টেস ঘর হতে বার হয়ে যেতেই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন এবং কয়েকটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও সামান্য কিছু জিনিসপত্র দ্রুতহাতে গুছিয়ে নিয়ে তাঁর গৃহচিকিৎসককে ঘুম থেকে উঠিয়ে জানান

যে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তাঁর একান্ত অনুরক্ত কনিষ্ঠা কন্যা আলেক্‌জান্দ্রা-কেও এ কথা জানানো হয়। অতঃপর কোচোয়ান-দের বিছানা থেকে তুলে তিনি সোজা স্টেশনে চলে আসেন।

তখন শীতকাল। তার ওপর রাশিয়ার শীত। চারিদিকে সবকিছু যেন ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। এর উপর টলস্টয় স্টেশনে বৃষ্টিতে বেশ একটু ভিজে গেলেন। বলা বাহুল্য বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে এটা রীতিমত মারাত্মক ব্যাপার। টলস্টয় স্থির করেছিলেন রস্তোভ-না-দানু অর্থাৎ রস্তোভ-অন-দন-এ যাবেন। কিন্তু এই ঠাণ্ডা লাগার ফলে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তারের নির্দেশে পথের মধ্যে অস্টোপাভো স্টেশনে নেমে পড়তে বাধ্য হলেন।

স্টেশন-মাস্টার যখন জানতে পারলেন যে রুগ্ন ব্যক্তিটি আর কেউ নয় স্বয়ং কাউণ্ট লিও টলস্টয় তখন তিনি শশব্যস্তে তাঁর কোয়ার্টার টলস্টয়-এর ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। পরদিন টলস্টয় গোপনে সব জানিয়ে চেরৎকোভ্-কে এক টেলিগ্রাম করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই গোপন রইলো না। টলস্টয় তখন এতই বিখ্যাত যে পৃথিবীর দূরতম কোণেও তাঁর পক্ষে গুপ্ত থাকা সম্ভব নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সবকিছু জানাজানি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চিকিৎসক, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক, প্রেস-ফোটোগ্রাফার প্রভৃতি অজস্র লোক এসে জড়ো হতে লাগল সেই ক্ষুদ্র স্টেশনে। অসংখ্য টেলিগ্রামের চাপে স্থানীয় টেলিগ্রাফ-অফিসের কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। টলস্টয়-এর সংবাদ জানার জন্য সমগ্র বিশ্ব ব্যগ্র, ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠ। সোনিয়া টলস্টয়ও সংবাদ পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে সেখানে চলে এলেন। কিন্তু টলস্টয় তখন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তাঁকে হঠাৎ দেখে উত্তেজনায় টলস্টয় হার্টফেল করে মারা যেতে পারেন এই আশঙ্কায় চিকিৎসকরা প্রথমে তাঁকে টলস্টয়-এর ঘরে প্রবেশ করতে দিলেন না। পরে তিনি যখন প্রবেশের অনুমতি পেলেন তখন টলস্টয়-এর আর জ্ঞান নেই। সোনিয়া ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। তারপর গভীর আবেগে তাঁর হাত চুম্বন করলেন। অজ্ঞান অবস্থায় টলস্টয় শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু কে যে এসেছে তা বোধহয় তাঁর অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

ভোর ছটার সামান্য কিছু পরে টলস্টয়-এর মৃত্যু হলো। সেদিন রবিবার। সাতই নভেম্বর। উনিশ শো দশ সাল।